মঙ্গলসূত্র

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৫৮
দ্বিতীয় মুদ্রণ

প্রচ্ছদপট-অঙ্কন
শ্রীসলিল বসু

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩ হইতে
এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীসারদা প্রেস, ৬৫ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯ হইতে পি. কে. পাল কর্তৃক মুদ্রিত

শ্রীমান অর্ণব মজুমদার

পরম কল্যাণীয়েষু

মঙ্গলসূত্র

মানব ছেলের মুখের দিকে কয়েকটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো।

কি জবাব দেবে আজ ছেলের প্রশ্নের বুঝতে পারে না। সত্যি কথা বলতে কি প্রশ্নটার কোন জবাবই যেন সে আজ খুঁজে পাচ্ছে না।

ছেলে আজ বড় হয়েছে। মনে মনে একটা হিসাব কবে নেয় মানব, সৌগন্ধর বয়স আজ তেইশ। দীর্ঘ পনের বছর আগে যেদিন সে বৈশালীর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে চলে আসে—সৌগন্ধর বয়স তখন মাত্র আট।

আশ্চর্য! সেদিন কেন তার একবারও মনে হয় নি পুত্রের দিক থেকে একদিন এই ধবনের একটা প্রশ্ন উঠতে পাবে। অথচ তারা তো পবস্পরকে ভালবেসেই বিবাহ করেছিল।

অনেকদিন ধরেই বিবাহেব পূর্বে তাবা পরস্পরকে চেনা ও জানার সুযোগ পেয়েছিল, পবস্পর তো পবস্পবেব কাছে অজানা, অচেনা ছিল না। তবে তাদেব সম্পর্কের মধ্যে কেন এমন করে চিড় ধরলো!

পরেও ঐ প্রশ্নটা অনেকবার মানবের মনের মধ্যে আনাগোনা করেছে, তবে কেন চিড় ধরলো পরস্পরের সম্পর্কের মধ্যে!

তবে কি তাদেব পরস্পরের চেনা ও জানাটার মধ্যে বোঝার একটা বিরাট ফাঁক ছিল কোথাও! নচেৎ অমনটাই বা হলো কেন!

পরস্পর পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন পথ নেই এবং সেটা বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্তাবটা দিয়েছিল প্রথমে মানবই।

তখন মধ্যরাত্রি।

সবে ফিরেছে বৈশালী একটা জলসা শেষ করে। পর পর অনেক-গুলো গানই তাকে সেদিন গাইতে হয়েছিল—ক্লান্ত অবসন্ন সে তখন।

ঘুমে চোখের পাতা দুটো যেন তখন বুজে আসছে।

বৈশালী ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল।

মানব একটা আরামকেদারার উপর বসে আছে—ওষ্ঠপ্রান্তে একটা অর্ধদগ্ধ জ্বলন্ত সিগারেট, পরনে পায়জামা ও তার উপর ড্রেসিং গাউন।

পাশের ঘরে সৌগন্ধ ঘুমোচ্ছিল।

এ কি! এখনো তুমি জেগে আছো—শোও নি?—প্রশ্ন করে বৈশালী।

মানব কোন জবাব দেয় না তার প্রশ্নের—নিঃশব্দে সিগারেট টানতে থাকে।

নিজের কাছেই যেন নিজে কৈফিয়ৎ দেবাব মত বৈশালী বলে, এত দেরি হয়ে গেল না, জলসার উদ্যোক্তারা কিছুতেই প্রথমে আমাকে গান গাইতে দিল না। পাঁচজনের পর—তারপর একটা বা দুটো গান গেয়ে যে নিষ্কৃতি পাবো তাও হলো না। চার-চারটে গান গাইতে হলো শ্রোতাদের অনুরোধে। রাত হয়ে গেল—খেয়েছো তো?

হ্যাঁ—শান্ত সংক্ষিপ্ত জবাব মানবের।

খোকন খেয়েছে?

হ্যাঁ।

আমার একটুও ক্ষিধে নেই—কথাগুলো বলে বৈশালী জামাকাপড় ছাড়বার জন্য তার নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াতেই মানব ডাকল, বৈশালী—

কিছু বলছিলে? বৈশালী ঘুরে দাঁড়াল।

বলছিলাম—

কি?

এমনি করে আর তো চলতে পারে না।

বৈশালী স্বামীর মুখের দিকে তাকায়।

মানব নিঃশেষিত সিগারেটটা অ্যাসট্রের মধ্যে গুঁজে আর একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললে, তাই বলছিলাম এইখানেই এর শেষ হোক।

বৈশালী তখনো চুপ।

মানব আবার বললে, সৌগন্ধ বড় হচ্ছে এবং আরো কয়েক বছর

পরে হয়তো—মানব থামল।

থামলে কেন, বল! বৈশালী বললে।

বলবো বলেই তো আজ জেগে বসে আছি—আমি কালই সৌগন্ধকে নিয়ে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো।

কিন্তু খোকন তো তোমার একার নয়। বললে বৈশালী।

কাল থেকে সে আমার একারই হবে। মানব বললে।

আমি খোকনকে ছেড়ে থাকতে পারবো না।

আমিও পারবো না,—শান্ত গলায় আবার বললে মানব।

খোকনের ভবিষ্যৎ আমি তোমার উপরে ছেড়ে দিতে পারি না। আমি তার মা।

আমি তার বাপ—আমার কর্তব্য ঢের বেশী। দেখো বৈশালী, আমাদের এই ব্যাপারটা আদালত পর্যন্ত গড়াক, দশের মধ্যে ব্যাপারটা জানাজানি হোক তা আমি চাই না।

তুমি কি মনে করো কাল তুমি চলে গেলে ব্যাপারটা সকলের মধ্যে জানাজানি হতে খুব বেশী সময় লাগবে!

তবু সেটা আদালত পর্যন্ত গড়াক তা আমি চাই না। তবে তুমি যদি চাও তো আমি লিখে দিয়ে যেতে পারি তোমার ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ তোমার, তার মধ্যে ভবিষ্যতে কোন দিনই আমি মাথা গলাতে আসবো না।

ধন্যবাদ—

শুধু তাই নয়, তুমি ইচ্ছা করলে পল্লবকে বিয়েও করতে পারো।

পল্লবকে বিয়ে করবো কি করবো না তা নিয়ে তোমার মাথা না ঘামালেও চলবে।

তবে তুমি যদি মনে করো আদালতেই এর মীমাংসা হবে—

আমরা যদি পৃথক হয়ে যাই-ই, সেটাই কি সমীচীন হবে না সব দিক দিয়ে! শান্ত গলায় প্রত্যুত্তর দিল বৈশালী।

বেশ, তবে তাই হবে।

কিন্তু খোকন? খোকন যদি তোমার সঙ্গে না যেতে চায়, অবিশ্যি

বয়সের দিক থেকে ওকে আমি আটকাতে পারবো না।

না—খোকন যদি তোমার সঙ্গে যেতে চায় তো আমি আটকাবো না। কেবল একটা শর্ত থাকবে ওর ভরণপোষণ লেখাপড়া সব কিছু আমার টাকায় হবে।

অত্যন্ত শান্ত ও ধীর ভাবে দু'জনার মধ্যে কথা হচ্ছিল। কারোর মধ্যে কোন উত্তেজনা বা চটাচটি নেই, যেন কোন সহজ ব্যাপার নিয়ে দু'জনার মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছিল। ঘরোয়া ভাবে ঘরোয়া কথাবার্তা।

মানব বললে, ঠিক আছে, তোমাকে আর আটকাবো না, তুমি ক্লান্ত।

বৈশালী নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ালো।

সম্পর্কের ভাঙন কিন্তু ধরেছিল প্রায় বৎসর দুই আগে থাকতেই এবং একটু একটু করে উভয়ের মধ্যেকার সেই ভাঙন ব্যবধান সৃষ্টি করে যাচ্ছিল।

ব্যবধান যে সৃষ্টি হচ্ছে তা দু'জনাব একজনারও অজ্ঞাত ছিল না।

বুঝতে পারছিল উভয়েই তারা পবস্পর থেকে একটু একটু করে দূরে সরে যাচ্ছে। একটা অদৃশ্য হাত দু'জনকে দু'জনা থেকে দূরে আরো দূরে যেন সরিয়ে নিচ্ছিল।

কিন্তু দু'জনাই মূক। কেউ কোন অভিযোগ তোলে না।

একটা ফাংশানে বৈশালীর গান শুনেই প্রথম মানব বৈশালীর প্রতি আকৃষ্ট হয়, তারপর আশ্চর্যভাবে উভয়ের মধ্যে পরিচয় ঘটে একটা বিয়ে-বাড়িতে।

পরিচয়, যত দিন যেতে লাগল, ঘনিষ্ঠ হতে লাগল।

প্রপোজালটা অবিশ্যি বৎসর দুই বাদ একদিন মানবই দিয়েছিল। অফিস থেকে বৈশালীর বাড়িতে ফোন করেছিল—

খুব ব্যস্ত নাকি? মানব ফোনে শুধায়।

না তো—কি ব্যাপার! বৈশালী জবাব দেয়।

আজ সন্ধ্যাবেলা একসঙ্গে চা খাবে?

কোথায়?

নতুন একটা রেস্টুরেন্ট হয়েছে আমাদের পাড়ায়—

তাই নাকি! কি নাম রেস্টুরেন্টটার?

অঙ্কুর। ছোট্ট রেস্টুরেন্ট কিন্তু খুব ছিমছাম। শান্ত পরিবেশ।

বৈশালীর প্রশ্ন, কখন যেতে হবে?

সাড়ে সাতটায়।

ওটা তো চা খাবার সময় নয়। মৃদু হেসে বৈশালী বলেছিল।

প্রত্যুত্তরে মানব হেসে বলেছিল, জান না any time is tea-time!

আসল ব্যাপারটি কি?

নতুন গাড়িটার ডেলিভারী নিয়েছি আজ।

সত্যি!

হ্যাঁ, রং তোমারই পছন্দ করা হালকা আকাশ-নীল।

হাউ লাভলি!

চা পান—তারপর লেকে গোটা দুই চক্কর—মনে থাকে যেন ঠিক সাড়ে সাতটা।

শীতের সময় সেটা। জানুয়ারীর মাঝামাঝি। তবে কলকাতা শহরে ঐ জানুয়ারীতেও তেমন শীত পড়ে না।

রেস্টুরেন্ট থেকে চা খেয়ে দু'জনে এসে উঠে বসল মানবের নতুন কেনা গাড়িতে। লেক কাছেই।

শীতের সন্ধ্যা বলে লেকে তেমন ভিড় ছিল না। লেকে গোটা দুই চক্কর দিয়ে একপাশে এসে লেকের মধ্যেই মানব গাড়িটা পার্ক করাল।

একটা সিগারেট ধরালো। গোটা কয়েক টান দিল।

মানব একাকী ঘরের মধ্যে আরামকেদারাটার উপর আধ-শোওয়া অবস্থায় বসে সেই সব পুরাতন দিনের কথাই ভাবছিল।

বৈশালী বোধ হয় এতক্ষণ জামাকাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়েছে। যাক কথাটা যে শেষ পর্যন্ত সে বলতে পেরেছে—ক'দিনই ভেবেছে কথাটা বলবে বলবে কিন্তু কেমন করে শুরু করবে সেটাই যেন মনের মধ্যে গুছিয়ে নিতে পারছিল না।

মানব জানত না, বৈশালী কিন্তু সে রাত্রে ঐ সময় জেগেই ছিল। বাইরের জামাকাপড় পর্যন্ত ছাড়ে নি, চুপচাপ অন্ধকারে জানলাটার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। বাইরে অন্ধকার। বড় রাস্তা থেকে বেশ কিছুটা ভিতরে বাড়িটা, তা হলেও বড় রাস্তার আলো খানিকটা ভিতরের রাস্তাটায় এসে পড়ে।

সেদিন সেই শীতের সন্ধ্যায় লেকের ধারে গাড়ির মধ্যে বসে—ফ্রন্ট সীটে পাশাপাশি।

বৈশালী, আমি ভেবে দেখলাম—

কি ?

একা একা ঘরে থাকতে আর ভাল লাগছে না। বিশেষ করে সন্ধ্যার পর যখন অফিস থেকে ফিরি—দেখেছো তো আমার ফ্ল্যাটটা—পাঁচতলার উপরে—সামনের ব্যালকনিতে বসে মনে হয় আর একজন পাশে অন্য একটা চেয়ারে থাকলে বোধ হয় ভাল লাগতো।

অন্ধকারে মানব দেখতে পায়—বৈশালী তখন ঠোঁট টিপে হাসছে আপন মনেই। পরে ব্যাপারটা জানতে পেরেছিল মানব।

মানব বলেছিল—cruel woman, তুমি হাসছিলে !

তাছাড়া আর কি করবো—

কি করবে মানে ! তাই বলে হাসবে ?

সে সময় তোমার গলার স্বর আর থেমে থেমে কথা বলা শুনলে জগতের সব মেয়েই হাসতো।

কিন্তু সেদিন গম্ভীর হয়েই বৈশালী বলেছিল, তা আমায় কি করতে হবে ?

রেজিস্ট্রী অফিসে যেতে হবে।

এখনই ?

না। পরশু বিকেলে। আমিই এসে তোমার বাড়ি থেকে তোমায় তুলে নিয়ে যাবো। প্রস্তুত থেকো।

বিয়ে হয়ে গেল।

মানব চৌধুরীর সঙ্গে বৈশালী দত্তর। এবং বিবাহ করবে বলেই মানব সাদার্ন অ্যাভিন্যুর উপরে তিনটে বেডরুমওয়ালা পাঁচতলার ফ্ল্যাটটা কিনেছিল এবং মনের মত করে ফ্ল্যাটটাকে সাজিয়েও ছিল। বাবা জগন্নাথ চৌধুরী মত দেন নি বলেই মানব ফ্ল্যাটটা কিনে বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছিল।

বিবাহের পর দু'জনে এসে ঐ ফ্ল্যাটে উঠলো।

বিবাহের পরেব বৎসরই সৌগন্ধ এলো বৈশালীর গর্ভে। আর সৌগন্ধর জন্মের পর থেকেই ক্রমশঃ একটু একটু করে উভয়ের সম্পর্কের মধ্যে চিড় ধরতে শুরু করলো। এবং আট বছর পরে অবশ্যম্ভাবী যা ঘটবার ঘটে গেল। গানের জগতে বৈশালী তখন রীতিমত সুপ্রতিষ্ঠিত। গ্রামোফোন ডিস্কে তার বৎসরে তিন-চারখানা গান বের হয়। রেডিওতে নিয়মিত আর্টিস্ট সে।

আশ্চর্য! যে গান—বৈশালীর যে গান একদিন মানবকে আকৃষ্ট করেছিল সেই গানই ক্রমশঃ কেমন করে যেন মানবের মনের মধ্যে একটা তিক্ততার সৃষ্টি করে, একটা বিতৃষ্ণা জাগায়!

বৈশালীর নাম সংগীতজগতে যত ছড়িয়ে পড়তে থাকে ততই ঐ তিক্ততা যেন ঘনীভূত হতে থাকে। দু'জনে দুই ঘরে শোওয়া শুরু করল।

মানবই একদিন তার শয্যা পৃথক ঘরে নিয়ে গিয়েছিল।

সৌগন্ধ একটা ঘরে শুতো, ওরা দু'জনে একটা ঘরে শুতো। দু'জনের শয্যা পৃথক ঘরে পড়লো। বাইরে থেকে কিন্তু কিছু বোঝা গেল না।

সংসার যেমন চলছিল তেমনিই চলতে লাগল।

তারপর সৌগন্ধর বয়স যখন আট, এক রাত্রে মানব তার শেষ কথাটা বৈশালীকে জানিয়ে দিল।

সৌগন্ধকে কেউ ছাড়তে চায় নি।

কিন্তু মীমাংসা হয়ে গেল সৌগন্ধের কথাতেই। সে তার বাপীর সঙ্গেই থাকতে চায়। সেই মতই ব্যবস্থা হলো।

জজ সাহেবের খাস কামরা থেকে বের হয়ে এলো দু'জনে। কারো

মুখে কোন কথা নেই।

আগে আগে সিঁড়ি দিয়ে নেমে মানব গিয়ে গাড়িতে উঠে বসল। বৈশালীর জন্য প্রায় আধ ঘণ্টা গাড়ির মধ্যে বসে অপেক্ষা করল কিন্তু বৈশালী এলো না। বৈশালী আর তার ফ্ল্যাটে ফিরে যায় নি।

সৌগন্ধ তার বাপীর কাছেই থাকল বটে, কিন্তু কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল।

মানব বোধ হয় ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিল। মাস দুয়েকের লম্বা ছুটি নিয়ে মানব ছেলেকে নিয়ে এক রাত্রে দূরপাল্লার এক ট্রেনে উঠে বসল।

দু'মাস বাদে যখন মানব ছেলেকে নিয়ে আবার ফিরে এলো সৌগন্ধ অনেক স্বাভাবিক। পরের দিন থেকে আবার সে স্কুলে যাতায়াত শুরু করেছিল।

বাপ আর ছেলেকে নিয়ে সংসার।

একজন আয়া—মীনা আর একজন ভৃত্য—শারণ।

বৈশালীর আর কোন খোঁজ নেয় নি মানব প্রায় দেড় বৎসর।

দুই

মানব ভেবেছিল বৈশালীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মন থেকেও বৈশালী সম্পূর্ণ মুছে যাবে। সব কিছুর পরিসমাপ্তি সেইখানেই। কিন্তু দিনের পর দিন মাস বৎসর গড়িয়ে গেল, তবু দেখা গেল সম্পর্কের শেষের সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুর শেষ হয় নি।

বৈশালী মনের অনেকটা জুড়ে আগের মতই বিরাজ করছে। বৈশালীকে সে ভুলতে পারে নি—পারছে না।

ইতিমধ্যে একটা ব্যাপার তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। পূর্বেকার মত আর কাগজে যেমন বৈশালীর নাম চোখে পড়ে না তেমনি রেডিওতেও বৈশালীর প্রোগ্রাম শোনা যায় না। মধ্যে মধ্যে কেবল বৈশালীর পুরনো রেকর্ড বাজানো হয় শ্রোতাদের অনুরোধে।

ব্যাপারটায় প্রথমে মানব তেমন গুরুত্ব দেয় নি, কিন্তু ক্রমশঃ ব্যাপারটা যেন কেমন তার মনের মধ্যে একটা জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করে।

বৈশালীর গান শোনা যায় না কেন? যে গান ছিল বৈশালীর প্রাণ সে গান বৈশালী কি ছেড়ে দিল? কিন্তু কেন?

প্রশ্নটার কোন জবাব যেন মানব খুঁজে পায় না।

মানব নিজেও কখনো বৈশালীর নাম উচ্চারণ করতো না। আশ্চর্য, সৌগন্ধও যেন তার মার কথা কখনো ভুলেও বলে না।

সে তার লেখাপড়া ও খেলাধুলো নিয়েই ব্যস্ত থাকে সর্বদা।

হঠাৎ ঐ সময় একটা ঘটনা ঘটলো।

ফ্ল্যাটটা কিনেছিল মানব প্রথমটায় পনের হাজার দিয়ে এবং চুক্তি ছিল বাকী টাকা মাসে মাসে সে নির্দিষ্ট অঙ্কে পরিশোধ করে আসবে। হঠাৎ হাউসিং স্কীমের সোসাইটির কাছ থেকে একটা রসিদ পেল।

বাকী টাকাটা শোধ করে দেওয়া হয়েছে সেই মর্মে।

মানব ভাবলো নিশ্চয়ই কোথায়ও ভুল হয়েছে, উদোর পিণ্ডি হয়ত বুধোর ঘাড়ে ওরা চাপিয়েছে।

সেই দিনই পাকা রসিদটা নিয়ে মানব সোসাইটির অফিসে গেল।

ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে বললে, দেখুন, আমাকে এই সব টাকা পরিশোধের পাকা রসিদটা পাঠানো হয়েছে। মনে হয় এটা ভুল করেছেন আপনারা!

ভুল করেছি—ম্যানেজার বললেন।

হ্যাঁ, কারণ আমি তো টাকা শোধ করি নি। একটু খোঁজ নিয়ে দেখুন তো।

ম্যানেজারও ব্যাপারটা না বুঝতে পেরে খাতাপত্র পরীক্ষা করে দেখবার জন্য অ্যাকাউন্ট্যান্টকে বললেন।

অ্যাকাউন্ট্যান্ট মিঃ বারিক সব খাতাপত্র দেখে বললেন, দশ দিন আগে একটা চেকে সব টাকা শোধ করা হয়েছে।

চেক! মানব বিস্মিত হয়।

হ্যাঁ।

কোন্ ব্যাঙ্কের উপরে চেক ! কে দিল—দেখুন তো !

অ্যাকাউন্ট্যান্ট সব দেখে আবার বললেন, কেন, আপনার স্ত্রীর চেক, বৈশালী চৌধুরী !

বৈশালী চৌধুরী—

হ্যাঁ।

সত্যি, বৈশালীই ছত্রিশ হাজার টাকা পেমেণ্ট করেছে সোসাইটিকে একটা চেকে এবং নির্দেশ দিয়েছে পাকা রসিদটা যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

মানব আর কোন কথা বললো না।

অফিস থেকে বের হয়ে এলো এক সময়।

কিন্তু অফিসে আর গেল না, গাড়ি চালিয়ে সোজা চলে এলো ফ্ল্যাটে।

লিফটে করে নিজের ফ্ল্যাটে উঠে কলিং বেল টিপতেই আয়া মীনা—

সে ঐ অসময়ে সাহেবকে ফিরতে দেখে একটু যেন বিস্মিতই হয়।

সে সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

দরজা খুলে দিতেই একটা পরিচিত গানের কলি, যে গানটা বহুবার শোনা মানবের, কানে আসতেই সে থমকে দাঁড়ায়।

বৈশালীরই একটা গান।

রেডিওগ্রাম বাজাচ্ছে কে ? মানব মীনাকে প্রশ্ন করে।

ছোট সাহেব—মীনা বললে।

খোকন—খোকন স্কুলে যায় নি ?

গিয়েছিল তো—কি জন্য যেন স্কুল ছুটি হয়ে গিয়েছে। আধ ঘণ্টা আগে ফিরে এসেছে।

মানব আর কিছু বললো না—সোজা পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল সৌগন্ধর ঘরের দিকে। দরজাটা খোলাই ছিল, বৈশালীর গানের সঙ্গে একটা গুনগুন সুর কানে এলো মানবের।

খোলা দরজাপথে উঁকি দিয়ে দেখলো—রেডিওগ্রামটা চালিয়ে দিয়ে সৌগন্ধ সামনে দাঁড়িয়ে বৈশালীর গানের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গুনগুন

করে গান করছে।

মানব চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

সৌগন্ধ গান গাইছে—

কখনো তো সে শোনে নি আজ পর্যন্ত সৌগন্ধকে গান গাইতে! তাই নয় কেবল, আজ পর্যন্ত কখনো সে শোনে নি সৌগন্ধকে রেডিওগ্রাম বাজাতে।

রেডিওগ্রামটা কিনেছিল এক সময় বৈশালীই। তার অত্যন্ত প্রিয়বস্তু ছিল ওটা। নিজের গানের রেকর্ড তো ছিলই, ঐ সঙ্গে নিজের পছন্দ-করা শিল্পীদের অনেক রেকর্ড সে কিনেছিল। বাড়িতে থাকলে প্রায়ই গান বাজিয়ে শুনতো বৈশালী।

আর ইদানীং মানব যতক্ষণ বাড়িতে থাকত, কখনও রেডিওগ্রাম বাজাত না। আগে বাজনাটা ছিল ওদের ঘরেই, পরে পৃথক শোয়ার ব্যবস্থা হবার পর বৈশালী গ্রামটা নিজের ঘরে নিয়ে এসেছিল।

বৈশালী চলে যাবার পর গ্রামটা সৌগন্ধর ঘরেই সরিয়ে দিয়েছিল মানব।

মাত্র তো দশ বৎসর বয়স হলো খোকনের, কিন্তু এর মধ্যেই বেশ যেন লম্বা হয়েছে। ছেলে তারই শরীরের গড়নটা যেন পেয়েছে।

কিন্তু খোকন তার মায়ের চোখমুখ পেয়েছে। খোকনের চোখের দিকে তাকালে তার নীল চোখের তারা যেন বৈশালীর চোখের নীল তারা দুটো মনে করিয়ে দেয়—তেমনি ওষ্ঠ দুটি—তেমনি কোমল চিবুক—

বৈশালীর সেই প্রিয় রবীন্দ্রসংগীত।

গানটা গেয়েছিলও বৈশালী যেন ডিস্কে প্রাণ ঢেলে ঃ

আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান—

মানব যে ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে—সৌগন্ধর গান শুনছে—সৌগন্ধ সেটা জানতেও পারে না। সে যেন গানের মধ্যে মগ্ন।

মানব কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে পায়ে পায়ে আবার ফিরে এলো নিজের ঘরে। অফিসের পোশাকও বদলানো হলো না—চেয়ারে বসল।

সৌগন্ধ গান গাইছে।

গানের সুর সৌগন্ধর মনকে ছোঁওয়া দিয়েছে।

তবে কি খোকনও তার মায়ের সংগীত-প্রীতি পেয়েছে!

সৌগন্ধর গান শুনে মনে হচ্ছিল গান সে আগেও গেয়েছে এবং নিয়মিত গায়। কিন্তু কবে শিখলো খোকন গান! এবং এও বোঝা যায় গান গায় সে গোপনে।

পাশের ঘরে তখন আর একটা বৈশালীর গান বাজছে।

রাত্রে মানব ছেলেকে সঙ্গে করে নিয়ে ডিনার খেত।

ডিনার খেতে খেতে বাপ ও ছেলের মধ্যে নানা ধরনের গল্প হতো। সেই ছোটবেলা থেকেই খোকন ছিল বাপের নেওটা। যত গল্প তার বাপের সঙ্গে ছিল বরাবর।

রাত্রে ডিনার টেবিলে বসে মুখোমুখি বাপ আর ছেলে সে রাত্রেও ডিনার খাচ্ছিল।

হঠাৎ এক সময় মানব ডাকলো, খোকন?

ইয়েস ড্যাডি।

পড়াশুনো কেমন হচ্ছে?

ভাল। জানো ড্যাডি, ম্যাথামেটিকস আর ইংলিশে এবারে আমি ফার্স্ট হয়েছি।

That's good.

দু'জনে নিঃশব্দে খেতে থাকে।

মীনা এক গ্লাস দুধ এনে সৌগন্ধর পাশে টেবিলের উপর রাখল এবং মানবের দিকে তাকিয়ে বললে, ছোট সাহেব আজকাল একদম দুধ খেতে চায় না সাহেব।

দুধ খাও না কেন খোকন? বাপ শুধায়।

দুধ তো বেবিফুড। আমি কি আর বেবি আছি ড্যাডি যে রোজ রোজ দুধ খাবো!

মানব হেসে ফেলে, No, you are a grown-up young man. দুধ কিন্তু শুধু বেবিরাই নয়—বড়রাও খায় খোকন।

সৌগন্ধ কোন প্রতিবাদ জানায় না।

খোকন—

সৌগন্ধ বাপের মুখের দিকে তাকাল।

তুমি গান শিখলে কবে?

গান!

হ্যাঁ। আজ তোমার গান শুনবো। Let us first finish the dinner. তারপর তোমার গান—

কিন্তু ড্যাডি—আমি তো গান গাইতে জানি না!

আমি যে তোমাকে গাইতে শুনেছি—

শুনেছো!

হ্যাঁ—রেডিওগ্রাম চালিয়ে গান গাইছিলে। আজ তোমার গান শুনবো।

ডিনার-শেষে দু'জনে এসে সৌগন্ধর ঘরে বসল।

মানব বললে, গাও।

কিন্তু ড্যাডি—

গাও, যে গান তোমার খুশি—

রাজ্যের সংকোচ যেন এসে সৌগন্ধকে অবশ করে দেয়। নিভৃতে গোপনে গোপনে যে সাধনা সে করেছে তা বাপের সামনে ব্যক্ত করতে যেন তার কুণ্ঠার অবধি নেই। তবু তাকে গাইতে হলো।

গান শুনে মানব বললে, ঠিক আছে খোকন, তুমি গান ছেড়ো না। কিন্তু সব কিছুরই একটা শিক্ষার ও সাধনার প্রয়োজন আছে। আমি তোমার গান শেখার ব্যবস্থা করবো।

সৌগন্ধও বাপের উৎসাহে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। বললে, সত্যি বলছো ড্যাডি!

হ্যাঁ—তবে একটা promise তোমাকে করতে হবে।

Promise!

হ্যাঁ—পড়াশুনায় অবহেলা করবে না—মনে রেখো তোমাকে

ডাক্তার হতে হবে।

বৈশালী বরাবর বলতো, ছেলেকে সে ডাক্তার করবে—ছেলেকে ডাক্তারী পড়াবে।

একজন গানের শিক্ষকের ব্যবস্থা করলো সত্যি সত্যিই মানব। বৈশালীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবার পর হতেই মানবেব মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা অপরাধ-বোধ তাকে অহর্নিশ পীড়িত করছিল। যে গান একদিন বৈশালীর প্রতি আকৃষ্ট করেছিল সেই গানই শেষটায় হয়েছিল পীড়ার কারণ—কথাটা যেন কিছুতেই মানব মন থেকে তার মুছে ফেলতে পারছিল না। পুত্র সৌগন্ধকে সেই গানের জগতেই প্রবেশ করবার অধিকার দিয়ে মানব যেন একটা সান্ত্বনা খুঁজে পাবার চেষ্টা করে।

সৌগন্ধ কিন্তু গান গাইবার অধিকার পেয়ে খুশীই হয়েছিল। কারণ মা ও বাবার সঙ্গে বিচ্ছেদের সময় আট বৎসরের বালক সৌগন্ধ অতশত বুঝতে পারে নি, পারবার ক্ষমতাও ছিল না। তার বালক-মন দিয়ে এইটুকুই কেবল বুঝতে পেরেছিল, মা ও বাবার মধ্যে মিল নেই।

আর মা যতই গান ভালবাসুক, তার ড্যাডি গান তেমন পছন্দ করে না।

মুখে সেটা কখনো অত্যন্ত সংযত-চরিত্রের মানব প্রকাশ না করলেও বালক সৌগন্ধর সেটা কিন্তু বুঝতে এতটুকু কষ্ট হতো না। তাই সে গানের ধার দিয়েও যেত না।

কিন্তু গান থেকে যতই সে দূরে থাকুক না কেন, গান আর সুর যেন তাকে এক অদৃশ্য টানে টানত। বাবার অনুপস্থিতিতে মা যখন মধ্যে মধ্যে গুনগুন করে আপন মনে কাজ করতে করতে গান গাইত সৌগন্ধর মন উন্মুখ হয়ে উঠতো।

গানের প্রতি তার ঐ আকর্ষণ বৈশালীর দৃষ্টিকে এড়াতে পারে নি। কিন্তু বৈশালী তো জানতই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরোধটা কোথায়, তাই সে মধ্যে মধ্যে ছেলেকে বলতো, গান গাস না খোকন কখনো।

কেন মা? খোকন শুধাতো।

না বাবা, তোকে ডাক্তার হতে হবে—মস্ত বড় ডাক্তার। ডাক্তারের জীবনে কি গান নিয়ে ব্যস্ত থাকলে চলে!

কেন মা? আমি ডাক্তার হয়েও গান শিখতে পারি না—গান গাইতে পারি না?

না, না—

কেন নয় মা?

জীবনে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী দুটো ব্যাপারে সাফল্য লাভ করা যায় না।

আমি ড্যাডিকে জিজ্ঞাসা করবো?

ওরে না, না। বৈশালী শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল ছেলের কথায়।

ড্যাডি বুঝি রাগ করবে?

হ্যাঁ।

কিন্তু তুমি তো গান গাও—তোমার গান শুনতে আমার কত ভাল লাগে। আমি ডাক্তারও হবো গানও গাইবো।

ব্যাপারটা সেদিন স্পষ্ট না বুঝতে পারলেও বালক সৌগন্ধ এটুকু বুঝেছিল, সে গান গায় ড্যাডি হয়ত সেটা পছন্দ করবে না।

আজ তাই সেই ড্যাডিই যখন তার গান শেখার ব্যবস্থা করে দিল সৌগন্ধর মনের মধ্যে যেন বিস্ময়েরই উদ্রেক করে। তবে সে খুশী হয়েছিল গান শিখবার সুযোগ পেয়ে নিঃসন্দেহে।

সৌগন্ধর লেখাপড়া ও গানের চর্চা চলতে লাগল অতঃপর।

•

যে স্ত্রীর মানব কোন রকম সন্ধান নেয় নি এতদিন পর্যন্ত, ঐ ফ্ল্যাটের টাকাটা শোধ দেবার পর থেকে মানব সেই স্ত্রীরই সন্ধান শুরু করে।

সম্ভব-অসম্ভব নানা জায়গায় সে বৈশালীর সন্ধান করে এবং যত সে সন্ধান করে আর ব্যর্থ হয় ততই যেন তার একটা জিদ চেপে যায়।

বৈশালী যেন একেবারে হারিয়েই গিয়েছে।

বৈশালীর বাপের বাড়িতেও সন্ধান নিল মানব, কিন্তু বৈশালী সেখানে যায়ই নি। কিন্তু কোথায় গেল বৈশালী?

রেডিও ও গ্রামোফোন কোম্পানি—সর্বত্র সে খোঁজ নিল বৈশালীর, কিন্তু বৈশালীর কোন সন্ধান করতে পারল না, বৈশালী ঐ দুই জায়গায় কোন যোগাযোগ রাখে নি। সে অনেক চেষ্টা করেও বৈশালীর কোন সন্ধান করতে পারে নি।

যে ব্যাঙ্কে বৈশালীর টাকা থাকত সেখানেও খোঁজ নিতে গিয়ে জানল বৈশালী কিছুদিন আগে তার ব্যাঙ্কে সঞ্চিত অর্থের উপরে একটা মোটা অঙ্কের চেক দিয়ে অ্যাকাউন্ট ক্লোজ করে দিয়ে গিয়েছে।

তাহলে বৈশালী কোথায় গেল?

যে গান বৈশালীর একদিন জীবন ছিল সেই গানই বা সে বন্ধ করে দিল কি করে? মুখে না বললেও বৈশালী কি বুঝতে পারে নি সেদিন পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদের মূলটা কোথায়? অবিশ্যি সে রাত্রে সে বৈশালীকে বলেছিল, ইচ্ছা করলে সে পল্লবকে বিয়ে করতে পারে!

কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পল্লবের কথাটা মানবের মনে পড়ে গেল।

পল্লব সেন।

প্রথিতযশা সংগীতশিল্পী পল্লব সেন।

বাংলার তো বটেই হিন্দীর সঙ্গীত জগতেও পল্লব সেনের সমান চাহিদা। সে কখনো বোম্বাই কখনো কলকাতায় ছুটাছুটি করে।

শুধু তাই নয়, তার সঙ্গে বৈশালীর বিবাহের পূর্বে জানতে পেরেছিল মানব, এমন কথাও শুনেছিল, একসময় নাকি বাজারে চালু হয়ে গিয়েছিল একটা কথা—পল্লব সেন বৈশালী দত্তকে বিবাহ করছে।

পল্লব সেনের সব গানের ডিস্কই ছিল বৈশালীর সংগ্রহের তালিকায়। পল্লব সেনের গান রেডিওতে থাকলে সমস্ত কাজ ফেলে বৈশালী শুনতো তার গান।

পল্লব সেন মানবের ফ্ল্যাটে মধ্যে মধ্যে আসতো, বৈশালীও যেতো পল্লবের চেতলার গৃহে। দু'জনে জলসায় কত গান গেয়েছে একসঙ্গে। ঠিক, একবারও পল্লব সেনের কথা কেন মনে হয় নি তার?

পরের দিনই ভোরবেলা গাড়ি চালিয়ে গিয়ে পল্লব সেনের চেতলার

বাসায় হাজির হলো মানব।

একা ব্যাচিলার মানুষ পল্লব সেন। আটত্রিশ থেকে উনচল্লিশের মধ্যে। একা থাকে দু' কামরাওয়ালা বাসাটার দোতলায়—একটা গলির মধ্যে। নিজে হাতে রান্না করে খায়।

পল্লবের বাড়ি কোথায় একজন যুবককে জিজ্ঞাসা করতেই সে বলে দিল।

রাস্তাটা খুব প্রশস্ত নয়। মানব তার গাড়িটা এনে দাঁড় করাল পল্লব সেনের বাড়িব সামনে। গাড়ি থেকে নামতেই একটা ভারী মিষ্টি গলার গানের সুব তাব কানে এলো।

কলিং বেলটা বাজাল।

একটু পরে এক প্রৌঢ় এসে দরজা খুলে দিলেন।

কাকে চাই ?

এ বাড়িতে পল্লব সেন থাকেন ?

হ্যাঁ—দোতলায়, সিঁড়ি দিয়ে উপরে চলে যান।

সোজা চলে যাবো উপরে ?

হ্যাঁ—যান। সবাই যায়।

মানব একটু বিস্মিত হয়, তবু সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যায়।

সিঁড়ির শেষে ছোট সরু একটা বারান্দা—সামনের ঘরটার দরজা খোলা—ঘরের ভিতর থেকে পল্লব সেনের গানের সুর ভেসে আসছে।

একটু ইতস্ততঃ করলো মানব, তারপর মৃদু কণ্ঠে ডাকল, পল্লব-বাবু—

বার দুই ডাকার পরই ঘরের ভিতর থেকে সাড়া এলো, কে ?

ভিতরে আসতে পারি ?

আসুন।

মানব ঘরের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করল। মাঝারি সাইজের ঘরটা—অর্ধেকটায় একটা শতরঞ্জি পাতা—চারিদিকে বাদ্যযন্ত্র এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে। গোটা দুই চায়ের কাপ—একগাদা বই—একটা সিগারেট ও ছাইভর্তি অ্যাসট্রে।

গোটাকয়েক সিগারেটের খালি বাক্স, দেয়াশলাই।

তিন

পল্লব হারমোনিয়ামটা কোলের কাছে নিয়ে বসে গান গাইছিল।

মানবকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে ওর দিকে তাকাল। মানব চৌধুরীকে চিনতে তার কষ্ট হয় না, প্রায় তিন বছর পরে হলেও।

মিঃ চৌধুরী না!

চিনতে পেরেছেন? মানব বললে।

চিনবো না মানে, কি আশ্চর্য—বলতে বলতে পল্লব সেন ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে, আসুন, আসুন।

রোগা পাতলা চেহারা পল্লব সেনের।

পরনে একটা পায়জামা ও পাঞ্জাবি। একমাথা রুক্ষ ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া অবিন্যস্ত চুল—মধ্যে মধ্যে তার সাদা চুল উঁকি দিচ্ছে—চোখে কালো সেলুলয়েডের ফ্রেমের চশমা। চারিদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে পল্লব সেন বললে, চলুন চলুন—এ ঘরে বসতে পারবেন না, পাশের ঘরে চলুন।

পল্লব সেন মানবকে নিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল। একটা সাধারণ চৌকিতে সাধারণ শয্যা পাতা, উপরে একটা দামী বেড-কভার এলোমেলো হয়ে আছে। একটা দামী রেডিওগ্রাম—কোন এক সময় বোধ হয় বাজানো হয়েছিল। ডিস্কে তখনো একটা রেকর্ড বসানো, ডালাটা তখনো তোলা।

এক পাশে দুটো সোফা—সিংগ্‌ল্‌, অন্য পাশে একটা বড় সোফা। সর্বত্রই ঘরের মধ্যে যেন একটা অগোছালো ভাব। মেঝের কার্পেটটা যে কত দিন ঝাড়া হয় নি কে জানে!

ছোট সেন্টার টেবিলের উপরে দুটো কাঁচের গ্লাস, একটা অ্যাসট্রে ছাইভর্তি। একটা আলমারি, তারও দরজা খোলা—ভিতরে জামাকাপড় দেখা যাচ্ছে।

চারিদিকে তাকিয়ে মানবের একটা সন্দেহের অন্ততঃ নিরসন হয়—বৈশালী পল্লবকে বিয়ে করে নি। কিন্তু করলই বা না কেন, সে তো বৈশালীকে মুক্তিই দিয়ে দিয়েছিল এবং পল্লব আর বৈশালী পরস্পর পরস্পরকে যে ভালবাসত সেটা তো আর কিছু মিথ্যা নয়।

বসুন মিঃ চৌধুরী—পল্লব আবার বললে।

পল্লববাবু—মানব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই প্রশ্ন করল, বৈশালী কোথায় জানেন?

শৈলী—পল্লব বরাবর বৈশালীকে 'শৈলী' বলেই ডাকত, মানব জানত না।

হ্যাঁ—বৈশালী। মানব আবার কথাটার পুনরাবৃত্তি করে।

কেন, এ প্রশ্ন করছেন কেন? বৈশালী তো আপনারই স্ত্রী, আপনারই জানবার কথা।

আমাদের ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে—শান্ত গলায় বললে মানব।

ডিভোর্স! কবে? পল্লব সেনের যেন বিস্ময়ের অবধি থাকে না।

দু' বছরের বেশী হলো।

আশ্চর্য! কই বৈশালী তো আমাকে বললো না সেদিন? তাছাড়া—কবে কত দিন আগে তার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল? কোথায় পল্লববাবু?

লক্ষ্ণৌয়ের একটা মিউজিক কনফারেন্সে। এই মাসখানেক আগেই তো, ডিসেম্বরের শেষাশেষি।

কনফারেন্সে সে বুঝি গান গাইতে গিয়েছিল?

না, এমনি শুনতে গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও ওকে দেখে কনফারেন্সের কর্মকর্তারা এবং আমিও কত করে বললাম গান গাইতে কিন্তু গান গাইল না।

গান গাইল না?

না।

কেন?

বললে, গান সে গাইবে না। কেন গাইবে না তা বললো না।

পল্লববাবু, সঙ্গে তার কেউ ছিল ?

না তো। সে একাই ছিল। এমন কি আপনার কথা জিজ্ঞাসা করাতে বললে, আপনি ভাল আছেন। কাজে ব্যস্ত তাই আসতে পারেন নি। ও একা এসেছে লক্ষ্ণৌতে।

আর কিছু বলে নি ?

না। কিন্তু আশ্চর্য, আপনাদের মধ্যে এমন একটা ব্যাপার ঘটে গিয়েছে তার সঙ্গে কথা বলেও কিছুই সেদিন বুঝতে পারলাম না। এখন বুঝতে পারছি—

কি ?

সে হয়ত ঐ কারণেই সব কিছু ছেড়ে দিয়েছে।

মানব অতঃপর কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলো। তারপর আবার মুখ তুলে তাকাল পল্লবের দিকে।

পল্লববাবু—আমি তো তাকে কখনো গান ছাড়তে বলি নি। সে গান ছেড়ে দিল কেন ? তাছাড়া আমি তো জানি গান তার কাছে কি এবং কতখানি ছিল।

আপনি জানেন না মিঃ চৌধুরী, শৈলী কেন গান ছেড়ে দিল ?

না।

তার কোন খবরই জানেন না ?

না।

আপনি শৈলীকে ভালবাসতেন জানি আর শৈলীও ভালবেসেই আপনাকে বিয়ে করেছিল।

পল্লববাবু, আমার একটা কথা রাখবেন ?

কি কথা ?

তার সঙ্গে আমার মনে হয় হয়ত আবার দেখা হবে। দেখা হলে আমাকে জানাবেন।

নিশ্চয়ই জানাব। কিছু যদি মনে না করেন তো আপনাকে একটা কথা বলি।

বলুন।

আপনাদের মধ্যে সেপারেশন কেন হলো আমি জানি না। তবে আমাকে কেন্দ্র করে যদি কিছু ঘটে থাকে তো জানবেন, আপনি ভুল করেছেন।

ভুল!

হ্যাঁ, ভুল।

আপনি কি বৈশালীকে ভালবাসেন না?

বাসি। এবং মিথ্যা বলবো না গানের পরে কাউকে যদি আমি ভালবেসে থাকি তো সে শৈলী। সে আপনাকে বিবাহ করায় আমি এতটুকুও দুঃখ পাই নি, বিশ্বাস করুন খুশীই হয়েছিলাম। আর তাই কোন দিনই আমার কথা সে জানতে পারে নি। কোন দিন ভবিষ্যতেও জানতে পারবে না। কিন্তু আজ কেনই বা আপনাকে কথাটা বললাম আপনি হয়ত ভাবছেন। আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন আমি আপনাদের ওখানে আর যেতাম না, যাওয়া আমি কেন বন্ধ করেছিলাম জানেন?

কেন?

আমাকে ঘিরে আপনার চোখের দৃষ্টিতে আমি সন্দেহের ছায়া দেখেছিলাম।

মানব চুপ করে থাকে।

পল্লব বলতে থাকে, আমাকে ঘিরে আপনার মনে একটা সন্দেহ জাগে যদি তাই সরে এসেছিলাম।

পল্লববাবু, আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।

না, না—এর মধ্যে ক্ষমার কি আছে! তবে একটা কথা—

কি?

আপনার প্রতি বৈশালীর ভালবাসার মধ্যে কোন খাদ ছিল না। তাই মনে হচ্ছে আপনি এত বড় ভুলটা কেন করলেন? ও যে আপনার জীবনে কত বড় সম্পদ ছিল সেটা আপনি বুঝলেন না কেন?

আমি চলি পল্লববাবু।

আসুন।

মানব উঠে পড়ল।

মানব মনে মনে যেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস নেয়। অন্ততঃ একটা দিক থেকে সে নিশ্চিন্ত হলো—বৈশালীর গানকে কেন্দ্র করেই যে একমাত্র মানবের মনটা ক্রমশঃ বিষিয়ে উঠেছিল তা নয়, পল্লব সেনও সে বিষ মন্থনে তাকে ইন্ধন যুগিয়েছে এবং সে মনে মনে ধরেই নিয়েছিল বৈশালী আর কোথায়ও যায় নি।

ঐ পল্লবের ওখানেই গিয়েছে। আর তাইতেই সে প্রথমেই এসেছিল পল্লব সেনের ওখানে। পল্লবের ওখানে বৈশালী আসে নি। তবে কোথায় গেল সে!

আর কোথায়ই বা সে যেতে পারে? মা বাবার কাছেও সে ফিরে যায় নি। বৈশালীকে যত দূর সে জানে সে কোন আত্মীয়স্বজনের কাছে যাবে না।

কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা, পল্লব সেনের কথা শুনে মনে হলো, বৈশালী গান ছেড়ে দিয়েছে।

গান ছেড়ে দিয়ে বৈশালী কি নিয়ে বাঁচবে?

কেমন করে বাঁচবে!

একটা কঠিন শাসনের অর্গল তুলে মনের যে দরজাটা মানব একদিন বন্ধ করে দিয়েছিল, আজ অকস্মাৎ আবার দুই বৎসর পরে সেই কঠিন অর্গলটা ভেঙে পড়ায় খোলা দরজাপথে স্মৃতির ঝরা পাতাগুলো বারবার এসে তার সারাটি ঘর ভরিয়ে দিতে লাগল।

বৈশালী আর বৈশালী।

রাস্তায় গাড়ি ড্রাইভ করতে করতে এদিক-ওদিক তাকায় মানব বারবার।

কারণে অকারণে গাড়ির রেডিওটা খুলে কান পেতে শোনবার চেষ্টা করে বৈশালীর গাওয়া সেই সব গানগুলো যা সে অনেক বছর ধরে রেকর্ডের সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর ঢেউগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে রেখে গিয়েছে—

যে-গান কিছুদিন ধরে তার কানে বিষ বর্ষণ করেছে, যে গান শোনার ভয়ে সে কখনো রেডিওর চাবি ঘোরায় নি।

বাড়ির মধ্যে যতক্ষণ থাকত এবং সে সময় যদি সৌগন্ধ থাকত, রেডিও বা ট্রানজিস্টারের ধার দিয়েও যেত না মানব।

ছোট দামী একটা ট্রানজিস্টার কিনেছিল, সেটা সর্বক্ষণই পকেটে থাকত। অফিসে নিজের কামরায় অনেক সময় সেই ট্রানজিস্টারের চাবি খুলে খুব নীচু ভলুমে গান শুনতো।

ব্যাপারটা কিন্তু একদিন নজরে পড়ে যায় তার পার্সোন্যাল স্টেনো মিস চন্দ্রাণী মল্লিকের।

সে একটু অবাকই হয়।

গম্ভীর রসকশহীন তার বসেরও তাহলে হৃদয়ের মধ্যে কোন জায়গায় সংগোপনে একটি কোমল তন্ত্রী আছে, সে তন্ত্রীতে সুর জাগে!

আরো অবাক হয়েছিল চন্দ্রাণী মল্লিক একটা মিউজিক কনফারেন্সে প্রথম সারিতে চুপটি করে বসে তার বস মানব চৌধুরীকে গান শুনতে দেখে।

মানব মিউজিক কনফারেন্স বা জলসাতেও যেতে শুরু করেছিল, যদি কোন জলসায় বা কনফারেন্সে হঠাৎ সে বৈশালীর দেখা পেয়ে যায়!

পল্লব সেন যেমন লক্ষ্ণৌয়ের কনফারেন্সে হঠাৎ বৈশালীর দেখা পেয়েছিল, সেও যদি তেমনি করে হঠাৎ দেখা পেয়ে যায়। পেতে কি পারে না! অনায়াসেই তো পেতে পারে। বৈশালী অন্ততঃ কল্পনাও করতে পারবে না অমন জায়গায় মানব যেতে পারে।

হঠাৎ যদি দেখা পেয়ে যায় সে অপেক্ষা করবে কখন গান-শেষে বৈশালী বের হয়ে আসে, ভিড়ের মধ্যে নিঃশব্দে পিছনে গিয়ে দাঁড়াবে। তারপর মৃদু গলায় ডাকবে, বৈশালী!

চকিতে হয়ত বৈশালী ফিরে দাঁড়াবে, কে?

আমি।

তুমি? বৈশালীর বিস্ময়ের যেন অবধি নেই।

হ্যাঁ, চলো।

কোথায় ?

কোথায় মানে—বাড়ি—আমাদের বাড়ি! কি ভাবছো, যে বাড়ি ছেড়ে একবার চলে এসেছো সে বাড়িতে আবার কেমন করে ফিরে যাবে ? দরজাটা তো আজো খোলাই আছে, বিশ্বাস না হয় চলো গিয়ে দেখবে।

কনফারেন্সে বসে বসে গান শুনতে শুনতে হঠাৎ যেন চমকে উঠেছে মানব, গান আর তখন সে শুনছে না। তার মন অনেক দূরে চলে গেছে, যেখানে ছায়া-ঘেরা শান্ত স্মৃতির মধ্যে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একান্ত নির্জনে সে আর বৈশালী।

সংবাদপত্রের যে পাতায় রঙ্গমঞ্চ, সিনেমা ও সঙ্গীতের কথা থাকে সে পাতাগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে মানব।

কিন্তু কোথায় বৈশালী ? বৈশালী হারিয়ে গিয়েছে।

সে তার নামটুকু পর্যন্ত মুছে নিয়েছে যেন সব কিছু থেকে।

কিন্তু মানব—মানব তো কই তা পারছে না! সে যে শবরীর মত প্রতীক্ষা করে আছে—কবে আবার বৈশালী ফিরবে!

কবে আবার সে গাইবে!

চার

ইনক্যামেরা জজসাহেবের হাতের ছাড়পত্রে তাদের শেষ স্বাক্ষর পড়বার পর আগে মানব ঘর থেকে বের হয়ে এসেছিল।

বৈশালী তখনো তার চেয়ারে বসে। মাথাটা বুকের কাছে ঝুলে

জজসাহেব মৃদুকণ্ঠে ডাকলেন, মিসেস চৌধুরী—

ধীরে ধীরে বৈশালী মুখ তুলে তাকাল। তার দু' চোখের কোল টলমল করছে জলে। তাড়াতাড়ি আবার বৈশালী মুখটা নামিয়ে নিল।

মিসেস চৌধুরী—

আমি তো আর মিসেস চৌধুরী নই স্যার।

হ্যাঁ তা ঠিক, আইন অবিশ্যি তাই বলবে। কিন্তু আপনি তো ছাড়পত্রে স্বেচ্ছাতেই স্বাক্ষর দিলেন।

মানব যে তাই চেয়েছিল।

কিন্তু আপনি বোধ হয় চান নি, তাই না?

আমি! হ্যাঁ—আমিও চেয়েছিলাম। বলে হঠাৎ উঠে পড়ে বৈশালী চেয়ার থেকে এবং নিঃশব্দে দু' হাত তুলে জজসাহেবকে নমস্কার জানিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে এলো।

লম্বা বারান্দাটায় তখন অনেক লোকের আনাগোনা।

কারো মুখের দিকে তাকাল না বৈশালী। মাথা নীচু করে বারান্দাটা অতিক্রম করে পিছনের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলো আদালতগৃহ থেকে।

বাইরের এত লোক—কেউ জানল না, জানতেও পারল না তার আর মানবের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে চিরবিচ্ছেদ হয়ে গেল।

সে আজ আর বৈশালী চৌধুরী নয়। সে বৈশালী দত্ত।

কেমন করে তা হয়। তাও কি সম্ভব—এই দীর্ঘ নয় বছরের সব-কিছু একটা কলমের আঁচড়ে মিথ্যে হয়ে গেল।

সে আর মানব চৌধুরীর কেউ নয়।

মানব চৌধুরীও তার কেউ নয়।

গত নয় বৎসরে যে বন্ধন, যে সম্পর্ককে তারা মনেপ্রাণে মেনে নিয়েছিল, যে আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে তারা একে অন্যের ঘনিষ্ঠ আপনজন হয়ে উঠেছিল সেটা কি সত্যি সত্যিই আজ থেকে মিথ্যা হয়ে গেল!

না, কিছুই যেন আর ভাবতে পারছে না বৈশালী। সব কিছুই যেন কেমন অবশ শিথিল হয়ে গিয়েছে।

আদালতের ভিড় ঠেলে ঠেলে বৈশালী এক সময় বড় রাস্তায় এসে পড়লো। তারপর সেখান থেকে দ্রুত রাস্তা পার হয়ে উলটো দিকে দ্রুতপায়ে হাঁটতে শুরু করল।

কোথায় যাবে এখন সে?

মানবের সেই পরিচিত ফ্ল্যাটটা তো তার দরজা বন্ধ করে দিয়েছে তার মুখের উপরে। তাছাড়া সেখানে সে আর যাবেই বা কেন? কোন্ সম্পর্কের দাবিতে সেখানকার দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে?

মানব হয়ত বলবে, তুমি! তুমি আবার এখানে কেন!

সঙ্গে সঙ্গে হয়ত মুখের উপরে তার দরজাটা বন্ধ করে দেবে। একটা খালি ট্যাক্সি ধরলো বৈশালী।

কিধার জায়গা মাঈজী? ট্যাক্সি-ড্রাইভার শুধালো।

হাওড়া স্টেশন।

মনে মনে তখন সে স্থির করেছে কলকাতার বাইরেই কোথায়ও চলে যাবে।

চলন্ত ট্যাক্সিতে বসে বসেই তার মনে হলো অতসীর কথা।

বান্ধবী অতসী অধ্যাপিকা, শান্তিনিকেতনে থাকে।

আপাততঃ অতসীর কথা মনে পড়লো যখন তখন সে অতসীর কাছেই যাবে।

অতসী একা সেখানে থাকে।

অতসী বৈশালীর বহুদিনের পুরাতন বান্ধবী।

একসঙ্গে একই কলেজে চার বছর পড়েছিল তারা। এখন তো কলেজ খোলা। অতসীকে পাবে সে।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ একটা রিকশায় চেপে অতসীর কোয়ার্টারের দরজায় এসে নামল বৈশালী। ঐ কোয়ার্টারে আগেও বার দুই এসেছে, তাই কোয়ার্টারটা চিনতে বৈশালীর কষ্ট হয় না।

অতসী তার ঘরেই ছিল।

কড়া নাড়ার শব্দে ঝুমনী এসে দরজাটা খুলে দিল।

তোর মাঈজী আছে? বৈশালী শুধায়।

আছে।

ভিতরের ঘর থেকে অতসীর গলা শোনা গেল, কে রে, ঝুমনী?

ঝুমনী চেনে না বৈশালীকে, আগে কখনো দেখে নি। বৈশালীকে

সে চিনতে পারে নি। সে বললে, এক মাঈজী।

মাঈজী! কে মাঈজী—বলতে বলতে ততক্ষণে অতসী বাইরে আসে। বৈশালীকে দেখে তো সে অবাক।

তুই, শৈলী! আয়, আয়—ভিতরে আয়। উঃ কত দিন পরে এলি! কত্তা যে তোর তোকে ছেড়ে দিলেন বড়!

অতসী বৈশালীকে নিয়ে এসে সোজা একেবারে তার শয়নঘরে এসে ঢুকলো। ঘরের আলোয় বৈশালীর শুষ্ক অবসন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে অতসী বললে, কি হয়েছে রে শৈলী, তোকে এমন দেখাচ্ছে কেন?

কিছু হয় নি। একটা আরামকেদারার উপরে বসতে বসতে বলল বৈশালী—এক কাপ চা খাওয়াতে পারিস?

ঝুমনীকে ডেকে অতসী চা করতে বললে।

অতসী কিন্তু বৈশালীর কথায় প্রত্যয় যায় না। কিন্তু দ্বিতীয় আর প্রশ্নও করে না।

আরো ঘণ্টাখানেক বাদে চা-পানের পর বৈশালী বলল, ক'টা দিন তোর এখানে থাকবো অতসী।

বেশ তো। তা কিছু তো সঙ্গে আনিস নি!

না। কেন রে তোর এখানে পরবার একটা শাড়ি পাওয়া যাবে না? বৈশালী বললে।

কেন পাবি না! কিন্তু ব্যাপারটা কি বল্ তো?

কিসের কি ব্যাপার?

হঠাৎ একেবারে খালি হাতে-পায়ে! হ্যাঁ রে শীত করছে না রে! দাঁড়া—অতসী একটা শাল এনে বৈশালীর গায়ে জড়িয়ে দিল।

সত্যিই বেশ শীত করছিল বৈশালীর, শালটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিল।

অতসী—

কি?

মানবকে ছেড়ে আমি চলে এলাম।

চলে এলি মানে! কথাটা বলে বিস্ময়ের সঙ্গে তাকাল অতসী বান্ধবীর মুখের দিকে।

চলে এলাম। চিরদিনের মত চলে এলাম।

খুলে বল্ মুখপুড়ী সব কথা। কি হয়েছে?

আমাদের ডিভোর্স হয়ে গেল।

ডিভোর্স!

হ্যাঁ—ডিভোর্স। কেন, হতে পারে না ডিভোর্স?

সত্যি বলছিস?

সত্যি না কি মিথ্যা বলছি?

মানববাবুর সঙ্গে তোর ডিভোর্স হয়েছে!

হ্যাঁ।

কেন?

ও আমাকে আর সহ্য করতে পারছিল না।

তোদের এত দিনের ভালবাসা—এত দিনের সম্পর্ক—

ভালবাসায় কি চিড় ধরতে পারে না? অতি বড় ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও কি একদিন শেষ হয়ে যেতে পারে না?

না, পারে না। বিশেষ করে তুই যেমন সহজ ভাবে বলছিস অমন সহজে যেতে পারে না।

পারে—পারে। নচেৎ আমাদের গেল কি করে!

ঝগড়া হয়েছিল বুঝি?

না, না। সে সব কিছু নয়। ও হঠাৎ একদিন বললে, এমন করে আর চলতে পারে না, এ ব্যাপারের এখানেই শেষ হোক।

আর তুইও অমনি—

উপায় কি বল্! অনুক্ষণ পাশাপাশি থেকেও যদি দু'জনকে শত যোজন দূরে থাকতে হয় তার চাইতে পীড়াদায়ক আর কি হতে পারে বল্। তার চাইতে কি এই ভাল হলো না, দু'জনে দু'জনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দূরে চলে গেলাম!

ব্যাপারটা কি এতই সহজ যেমন তুই বলছিস?

তাই তো দেখলাম, অত্যন্ত সহজেই তো সব হয়ে গেল।

আর তোর ছেলে—

ছেলে!

হ্যাঁ। খোকন—সৌগন্ধ?

সে তার বাপের কাছেই রইলো।

তাকে ছেড়ে তুই থাকতে পারবি?

থাকতেই হবে।

অতসী কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর বললে, জানি না কেন ডিভোর্স হলো তোদের, তোদের দু'জনাবই টেম্পারামেণ্ট তো আমি জানি। তোদেব মধ্যে যে এমন একটা কিছু ঘটতে পারে—

মৃদু হেসে বৈশালী বললে, ঘটতে পারে তুই কখনো ভাবতেও পারিস নি—তাই না?

হ্যাঁ। আচ্ছা আর কি মিটমাটের কোন আশাই নেই?

না রে—নচেৎ আমিই কি মেনে নিতাম?

এখানে ক'টা দিন থাকবি তো? দুম করে আবার চলে যাবি না তো?

না। মনের উপর দিয়ে অনেক ঝড় গিয়েছে, ক'টা দিন কেবল পড়ে পড়ে ঘুমবো।

কিন্তু ঘুমাতে পারে নি বৈশালী।

যে তিনটি দিন ছিল একটা রাতও সে ঘুমাতে পারে নি। ভেবেছে আর কেবল ভেবেছে। এখানে থাকা চলবে না। কেবল এখানেই নয়, কলকাতা শহরে এবং তার আশেপাশেও সে থাকবে না। অনেক দূরে তাকে যেতে হবে। হাত তার শূন্য নয়, ব্যাঙ্কে তার অ্যাকাউণ্টে বেশ মোটা রকমের টাকা জমেছে এই কয় বৎসরে, রেকর্ডের রয়ালটি, জলসা ও রেডিও প্রভৃতিতে গান গেয়ে যা সে উপায় করেছে সব তার ব্যাঙ্কে জমেছে। মানব সে টাকায় হাত দেয় নি কোন দিন।

বলেছে, না, ও টাকা তোমার। তোমার অ্যাকাউণ্টেই জমা থাক।

কেন, আমার রোজগারের টাকা কি তুমি নিতে পারো না মানব?

বৈশালী বলেছে।

প্রয়োজন হলে নেবো বৈকি।

সত্যি বলছো ?

হ্যাঁ।

টাকা নিত না তাই বৈশালী মধ্যে মধ্যে মানবের জন্য শার্ট বা স্যুটের জন্যে কাপড়, রুমাল প্রভৃতি কিনে নিয়ে আসতো।

মানব সানন্দে সে সব গ্রহণ করেছে।

হঠাৎ একটা কথা মনে হয় বৈশালীর। আচ্ছা, হঠাৎ সেদিন মানব পল্লবকে বিয়ে করার কথা বললে কেন ? তবে কি পল্লবকে নিয়ে তাকে মানব সন্দেহ করতো আর তাই এমনটা ঘটে গেল !

সে বোবা হয়ে গিয়েছিল মানবের মুখে সেদিন ঐ কথাটা শুনে যেন। তাই কোন জবাব দেয় নি।

তার রুচিতে বেধেছে।

নোংরামি আর নীচতাকে সে চিরকাল ঘৃণা করে এসেছে। তাই সেদিন মানবের কথার জবাব দেবারও প্রয়োজন বোধ করে নি।

কেমন করে কথাটা মানবের মনে হয়েছিল !

এত বছর একসঙ্গে থেকেও মানব তাকে চিনতে পারল না ! কিন্তু সে—সে-ই কি নিজে মানবকে এত বছরে চিনতে পেরেছিল !

কলকাতায় একটা বিশেষ কাজ আছে বলে বৈশালী অতসীর বাসা থেকে চলে এসেছিল। মনটা তখন তার অনেক শান্ত।

অতসী বোধ হয় বুঝতে পেরেছিল বৈশালী আর ফিরবে না, তাই সে শুধিয়েছিল, আবার ফিরবি তো ?

বলতে পারছি না। বৈশালী বলেছিল।

একটা কথা দিবি ?

কি ?

যেখানেই যাস, যেখানেই থাকিস, আমাকে জানাবি বল্ !

বৈশালী বলেছিল, একটু থিতু হয়ে বসলেই জানাবো।

ঠিক তো ?

কেন, প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিবি নাকি ?

না, আমি তো জানি তোকে—প্রতিজ্ঞার বন্ধন দিয়ে আর যাকেই বাঁধা যাক, তোকে কোনদিন বাঁধা যায় না।

প্রত্যুত্তরে একটু হেসেছিল বৈশালী।

পাগলের মতই তার পর আট-নয় মাস বৈশালী এখানে ওখানে ঘুরে বেড়িয়েছে। দিল্লী, ফতেপুর সিক্রী, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন, এলাহাবাদ, বেনারস। সেই সময়ই হঠাৎ একদিন ট্রেনে দেখা প্রত্যুম্ন সান্ন্যালের সঙ্গে।

বিশেষ একটা রাজনৈতিক দলের পাণ্ডা প্রত্যুম্ন সান্ন্যাল। ব্যাচিলার মানুষ, সংসারের কোন ঝুটঝামেলা নেই। লম্বাচওড়া মানুষটা প্রচণ্ড আমুদে ও হাসিখুশী।

রাজনীতি করে জীবনে বহুবার জেল খেটেছে ইংরাজ আমলে। এম. এ. পর্যন্ত ইংরাজী সাহিত্য পড়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা দেয় নি—দেওয়া হয়ে ওঠে নি। এম. পি. হয়েছিল প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে লক্ষাধিক ভোটে জিতে।

নেহরু তাকে মন্ত্রিত্বও দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু প্রত্যুম্ন সান্ন্যাল সম্মত হয় নি। এলাহাবাদ থেকে দিল্লী যাবার পথে রিজার্ভেশন না থাকায় বৈশালী যখন এক শীতের রাত্রে প্ল্যাটফরমে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, প্রত্যুম্ন তখন তাকে ডেকে তার কম্পার্টমেণ্টে তুলে নিয়েছিল।

রিজার্ভেশন আছে ? প্রত্যুম্ন শুধিয়েছিল।

বৈশালী বলেছিল—না।

তবে জায়গা এ ট্রেনে কোথাও পাবেন না। আসুন, আমার কামরায় একটা সীটেই ভাগাভাগি করে যাওয়া যাক।

না, না—

ভাবছেন আমার অসুবিধা হবে! কিছু অসুবিধা হবে না। রাত্রে আমি কোনদিন ট্রেনে ঘুমোই না। আসুন, কোথায় কত দূর যাবেন ?

দিল্লী।

রাজধানীতে? চলে আসুন, আমিও রাজধানীর যাত্রী।

বৈশালী আর আপত্তি করে নি।

আপত্তি করলে পরের দিনের আগে সে ট্রেন পেত না কোন।

এক সময় ট্রেন ছেড়ে দিল।

কফি খাবেন? আমার ফ্লাস্কে কফি আছে।

না—আমি কফি খাই না। বৈশালী বললে।

পাঁচ

কামরার অন্য তিনজন যাত্রী তখন কম্বল মুড়ি দিয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

আরাম করে বসুন, পথ এখনো অনেক বাকী। প্রত্যুম্ন বললে, আপনি বিশ্বাস করুন সত্যিই রাত্রে ট্রেনে আমি ঘুমোই না।

তা হঠাৎ—আবার প্রত্যুম্ন একটু থেমে বললে, রিজার্ভেশন না করে রাত্রের ট্রেনে আসছিলেন কেন?

বৈশালী বললে, সন্ধ্যার সময় হঠাৎ ডিসাইড করলাম দিল্লী যাবো—

কোন মিউজিক কনফারেন্স আছে বুঝি? প্রত্যুম্ন প্রশ্ন করে মৃদু হেসে বৈশালীর মুখের দিকে তাকিয়ে।

না, না—

তবে এ সময় আপনি দিল্লী চলেছেন? প্রত্যুম্ন সান্ন্যালের মুখে মৃদু হাসি।

আপনি কি আমাকে চেনেন? বৈশালীর বুকের মধ্যে কাঁপুনি শুরু হয়েছে তখন। প্রত্যুম্নর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে তখন বৈশালী।

চিনি বৈকি। মিটিমিটি হাসছে প্রত্যুম্ন।

চেনেন? বৈশালী তখন ভাবছে—কে মানুষটা? মনে পড়ছে না কখনো ওকে ইতিপূর্বে দেখেছে সে।

হ্যাঁ, মানে ছবিতে—

ছবিতে! আরো বিস্ময় তখন যেন বৈশালীর মনের মধ্যে।

হ্যাঁ, সংবাদপত্রে অনেক ছবি দেখেছি তো আপনার।

মনে মনে যেন হাঁফ ছাড়ে বৈশালী এতক্ষণে।

আপনার ছবি দেখেছি আর গানই শুনেছি, কিন্তু আজ চাক্ষুষ পরিচয়টা হয়ে গেল কেমন আশ্চর্যভাবে দেখুন! আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন, কে আমি মানুষটা? আমার নাম প্রত্যুম্ন সান্ন্যাল। পেশা ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো কিংবা এও বলতে পারেন, নেই কাজ তো খই ভাজ!

মানে?

মানে যা বললাম তাই, আর কোন মানে নেই। আপনি কিন্তু এখনো ফ্রি হতে পাবছেন না মিসেস চৌধুবী। বসুন না ভাল করে, আরাম করে।

বৈশালী ততক্ষণে নিজেকে অনেকটা সহজ ও স্বাভাবিক বোধ করছে। সে গায়েব শালটা ভাল কবে গায়ে জড়িয়ে বসলো।

এক সময় আবাব প্রত্যুম্ন সান্ন্যাল বললে, জানেন মিসেস চৌধুরী, আমিও এক সময় একটু-আধটু সংগীতের চর্চা করেছি।

তাই বুঝি!

হ্যাঁ, তবে কণ্ঠসংগীতের যে নয় তা নিশ্চয়ই আমার গলাটা শুনেই বুঝতে পারছেন। বলতে বলতে মৃদু হাসলো প্রত্যুম্ন সান্ন্যাল।

তবে কি?

বেহালা বাজাতাম।

ভায়োলিন?

হ্যাঁ।

এখন বুঝি আর বাজান না?

না। সে পাঠ অনেক দিন চুকে-বুকে গিয়েছে বৃটিশ সবকাবের কৃপায়।

কি রকম?

আমাকে তারা আদৌ বিশ্বাস করতো না। তারা ভাবতো আমার

হাতের অব্যর্থ বুলেট যে রিভলভার থেকে ছুটতো সেটা লুকিয়ে হয়ত থাকতো আমার ঐ ভায়োলিনটার মধ্যেই।

আপনি টেররিস্ট ছিলেন?

তারা অবিশ্যি তাই বলতো। তবে দেশকে স্বাধীন করার কথাটা যেমন ভাবতাম তেমনি বিশ্বাস করতাম শান্তির পথ ধরে দেশ স্বাধীন কখনো হয় নি—হতে পারে না। আর কথাটা যে মিথ্যা নয় তাও তো প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। আপনিই বলুন না মিসেস চৌধুরী, যায় নি কি?

আমি অত বুঝি না।

কেন বোঝেন না? নেতাজীর আই. এন. এ.-র ব্যাপারটা যদি না ঘটতো এবং তারই পথ ধরে যদি এ দেশে শেষ পর্যায়ে নৌ-বিদ্রোহ না ঘটতো, আপনি কি মনে করেন ব্রিটিশ সরকার আমাদের হাতে দেশটা তুলে দিত! না—তা দিত না। তারা বুঝতে পেরেছিল যে, যাদের উপর নির্ভর করে এত বড় দেশটাকে তারা এত বছর ধরে পায়ের তলায় দাবিয়ে রেখেছিল, সেই বিশ্বাসের মূলেই ঘুণ ধরেছে। অতএব মানে মানে এবার সরে পড়। যাকগে ওসব কথা!

তা আপনি—বৈশালী বললে—দিল্লী যাচ্ছেন কেন?

পার্লামেন্টের সেসন শুরু হচ্ছে যে—

ও, আপনি একজন এম. পি., তাই না?

হ্যাঁ। কিন্তু ভাল লাগছে না সত্যি বলতে কি!

কি ভাল লাগছে না, এম. পি. হয়ে কাজ করা?

ঠিক। কারণ কাজের কাজ কিছুই হয় না আমাদের ঐ লোক-সভায়। কেবল নিজ নিজ স্বার্থের দলাদলি। কিন্তু আমার কথা থাক, আপনি এ সময় দিল্লী যাচ্ছেন কেন?

এমনি।

মানে?

সত্যি, এমনিই চলেছি।

বেড়াতে?

বলতে পারেন তাই।

বৈশালী নিজেকে গুটিয়ে নেয়।

দিল্লীতে পৌছবার দিন দশেক পরে এক সন্ধ্যায় হঠাৎ কনট প্লেসে একটা দোকানের সামনে দু'জনার আবার দেখা।

আরে মিসেস চৌধুরী যে, এদিকে কোথায়?

এই ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। আপনি—

হনুমান রোডে যাচ্ছিলাম।

সেখানে থাকেন বুঝি?

আমার তো সর্বত্রই বাস। ওখানে মাতাজীর একটা আশ্রম আছে, যাবেন? চলুন না, আনন্দ পাবেন। তা ছাড়া আপনি তো গান ভালবাসেন, সন্ধ্যার পর মাতাজী কীর্তন করেন, শুনলে মুগ্ধ হয়ে যাবেন। যাবেন? কয়েক দিন হলো মাতাজী এখানে এসেছেন। চলুন না, যাবেন?

বেশ চলুন।

ওরা যখন আশ্রমে গিয়ে পৌছল, ঘরের মধ্যে মাতাজী তখন কীর্তন করছিলেন। মাতাজীর বয়স বেশী নয়, চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে।

কাঁচা সোনার মত গাত্রবর্ণ। রোগা পাতলা চেহারা, সমগ্র মুখখানি জুড়ে যেন স্বর্গীয় প্রশান্তির অপূর্ব এক লাবণ্য।

পরনে লালপাড় গেরুয়া রঙের একটা শাড়ি, গায়ে সামান্য একটা চাদর। আসনের উপর বসে দুটি হাত কোলের উপর জড়ো করা, দুটি চক্ষু মুদ্রিত। কীর্তন গাইছেন।

পাশে একজনের হাতে তানপুরা, অন্যজনের হাতে খঞ্জনী।

প্রায় কুড়ি-পঁচিশ জন নানা বয়েসী নরনারী চক্রাকারে তাঁকে ঘিরে বসে কীর্তন গান শুনছে তন্ময় চিত্তে। মেয়েদের মধ্যে এক পাশে বৈশালীকে বসিয়ে দিয়ে প্রদ্যুম্ন সান্ন্যাল যেন কোথায় চলে গেল এবং একটু পরেই দেখা গেল হাতে বেহালা নিয়ে এক পাশে বসে পড়েছে সে।

বেহালায় সুর ওঠে।

বৈশালী বুঝতে পারে অত্যন্ত দক্ষ হাত প্রদ্যুম্ন সান্ন্যালের।

অনেক রাত্রে কীর্তনের আসর ভাঙল।

বৈশালীর কি হলো সে নিজেই এগিয়ে গিয়ে মাতাজীর পদধূলি গ্রহণ করে।

পাশেই ছিল তখন প্রত্যুম্ন সান্ন্যাল।

মাতাজী বললেন, কে তুমি মা? তোমাকে তো ঠিক চিনলাম না?

প্রত্যুম্ন সান্ন্যাল বললে, ওকে চিনলেন না মা? যার গান শুনতে আপনি খুব ভালবাসেন—বৈশালী চৌধুরী!

ও মা! তাই নাকি!

কনট প্লেসে ঘুরছিলেন, ধরে নিয়ে এলাম।

বেশ করেছো বাবা—মাতাজী বললেন।

মাতাজী বৈশালীর মুখের দিকে তাকিয়ে স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বললেন, কিন্তু তোমার সারা মুখে দুঃখ আর বেদনা কেন ছড়িয়ে আছে মা?

বৈশালী মাথাটা নীচু করে।

ও দুটো এমনিই বস্তু মা যে প্রশ্রয় দিলে তোমাকে পেয়ে বসবে।

কেন জানি না বৈশালীর দুই চোখের কোলে অশ্রু টলমল করে ওঠে।

মাথায় দেখছি সিঁদুর, বিবাহিতা? মাতাজী বললেন আবার।

বৈশালী চুপ করে থাকে।

তা সংসার ছেড়ে এমন অনির্দিষ্ট ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছো কেন? এখানে কোথায় থাক?

হোটেলে আছি।

হোটেলে কেন মা? যত দিন খুশি তুমি অনায়াসেই আমাদের এই আশ্রমে এসে থাকতে পার। প্রত্যুম্ন—

মাতাজী!

যাও, ওকে সঙ্গে করে হোটেলে গিয়ে ওর জিনিসপত্রগুলো এখানে নিয়ে এসো। জগৎ সিং তার গাড়িটা এখানে রেখে গিয়েছে, সেই গাড়িটা নিয়ে যাও। বলে মাতাজী উঠে পড়লেন। তাঁর পূজা-আহ্নিকের সময় হয়েছে।

চলুন মিসেস চৌধুরী, প্রত্যুম্ন সান্ন্যাল বললে।

প্রত্যুম্ন সান্ন্যাল বৈশালীকে মাতাজীর আশ্রমে পৌঁছে দিয়েই চলে গিয়েছিল। জিনিসপত্রও বিশেষ কিছুই নয়, এক কাপড়ে বের হয়ে এসেছিল বৈশালী এক সময় স্বামীগৃহ থেকে। তারপর নিত্যকার ব্যবহার্য কিছু কিছু জামা-কাপড় ও টুকিটাকি জিনিস কিনেছিল। সব কিছু থাকত একটা মাঝারি সাইজের সুটকেসে, সেই সুটকেসটাই কেবল ছিল।

মাতাজী বৈশালীর থাকবার ব্যবস্থা করেছিলেন আশ্রমের এক প্রৌঢ়া নারীর ঘরে একসঙ্গে। আশ্রমে সবাই সেই প্রৌঢ়াকে কাকীমা বলে ডাকত। কারণ তিনি মাতাজীর সম্পর্কে কাকীমা ছিলেন।

রাত্রে ক্ষুধা নেই বলে সামান্য ফলমূল খেয়েছিল বৈশালী—রাধা-নাথের প্রসাদী।

ঘরের মধ্যে একটা আলমারিতে অনেক বই ছিল, তা থেকেই একটা বই বেব করে বৈশালী শয্যার উপরে বসে পড়ছিল।

কিন্তু পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে তার মন ছিল না।

আজ প্রায় এক বৎসর গৃহ ছেড়ে এসেছে সে, কিন্তু এখনো সর্বক্ষণ মনের মধ্যে আনাগোনা করে তার স্বামী, পুত্র আর কলকাতায় ফেলে আসা নিজের হাতে সাজানো-গোছানো ছোট্ট সংসারটি। চোখ বুজলেই যেন সে তার সেই ফ্ল্যাটের মধ্যে চলে যায়। ভাবে, কেন এমনটা হলো? সুখের সংসারে তার কেন ভাঙন ধরলো?

কাকীমা এলেন ঘরের মধ্যে, এই যে, এখনো তুমি শোও নি দেখছি মা! মাতাজী তোমাকে ডাকছেন।

বৈশালী সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ায়।

কাকীমা বৈশালীকে মাতাজীর শয়নকক্ষে পৌঁছে দিয়ে চলে গেলেন। আশ্রমের খুঁটিনাটি অনেক কাজ পড়ে আছে—সারতে বাকী।

ঘরের মধ্যে একপাশে মাতাজীর গুরুজী সত্যানন্দ মহারাজের বিরাট একটি তৈলচিত্র, অন্য পাশে কালো পাথরের রাধানাথ সিংহাসনে উপবিষ্ট।

একপাশে ভূমিতে একটি কম্বল বিছানো, তাতেই শয়ন করেন

মাতাজী। কোন উপাধান নেই শিয়রের ধারে। একটি জলচৌকির উপর কিছু বই-খাতাপত্র, একটি ঝর্না কলম। মাতাজীর পরনে গেরুয়া রঙের চওড়া লালপাড় সিল্কের শাড়ি—কিছুক্ষণ আগে স্নান করেছেন বোঝা যায়—সিক্ত কুন্তলরাশি পৃষ্ঠের উপর ছড়ানো, গায়ে একটা সাদা থান।

কোলের উপর দুটি হাত জড়ো করে বসেছিলেন।

বৈশালী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতেই বললেন, এসো মা, বোস।

মেঝের উপরেই উপবেশন করল বৈশালী।

না, না—মেঝেতে নয়, আমার শয্যাব উপর উঠে বোস মা, মাতাজী বললেন।

বৈশালী শয্যার উপর উঠে বসল।

কিছু খেয়েছো?

হ্যাঁ। তারপর একটু থেমে বৈশালী ডাকলো, মাতাজী—

বল মা!

আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকেই কেন যেন আমার মন বলছে, যে সমস্যার কোন সমাধান আমি খুঁজে পাচ্ছি না, আপনার কাছে নিবেদন করতে পারলে হয়ত—

মাতাজীর ওষ্ঠপ্রান্তে মধুর এক টুকরো হাসি জেগে ওঠে। তিনি শান্ত গলায় বলেন, জানি না মা তোমার কি সমস্যা, কিন্তু সমস্যা যত বড়ই হোক, গোপালের চরণে নিবেদন কর—দেখবে সব মীমাংসা হয়ে গেছে।

তবু সব কথা আপনাকে আমি বলতে চাই—

তুমি কিছু বলতে চাও, তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে সেটা অনুমান করেই তোমাকে আমি ডেকে পাঠিয়েছি।

মা—

বল মা কি তোমার বলবার আছে!

বৈশালী কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলো, তারপর এক বৎসর পূর্বে তার জীবনে যা ঘটে গিয়েছে সব বলে গেল।

আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না আমার সন্তানকে, আমার স্বামীকে। আমার সংসার—

কেন তুমি সব কিছু ভুলে যাবে মা! ও তো ভোলা সহজ নয়। ও এমনি একটা বন্ধন যে ছিঁড়তে চাইলেও ছেঁড়া যায় না।

কিন্তু আমি যে আর সেখানে ফিরে যেতে চাই না মা।

বাসনা আর কামনা থেকে মুক্ত হওয়া বড় কঠিন মা। সংসার করতে গেলে ও-রকম ভুল-বোঝাবুঝি হয়েই থাকে মা। আবার একদিন সব কিছুর সমাধানও হয়ে যায়।

কিন্তু তার তো কোন পথই আমার সামনে আমি দেখতে পাচ্ছি না মা।

পাবে। সময় হলেই পাবে। আমি একটা কথা বলবো মা?

বলুন।

গান তুমি ছেড়ো না।

ছাড়বো না?

না। ঐ গানই একদিন তোমাকে মুক্তির পথের সন্ধান্ দেবে।

কিন্তু গলা দিয়ে আর আমার সুর বের হয় না।

বের হবে। চেষ্টা করো, আবার সুর তুমি খুঁজে পাবে।

বৈশালী মাতাজীর পায়ের উপর মাথাটি রেখে তাঁকে প্রণাম করে। গভীর মমতায় মাতাজী তার মাথায় হাতখানি রাখেন।

ঐ দিনই রাত্রিশেষে আশ্রমের সকলে যখন নিদ্রাভিভূত, ঘর থেকে বের হয়ে এলো বৈশালী। কাকীমা তখন ঘরে ছিলেন না, পূজার আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন।

ঘর থেকে বের হয়ে বারান্দা অতিক্রম করে সদর দরজা খুলে বৈশালী বাইরে রাস্তায় এসে দাঁড়াল গায়ে শালটা জড়িয়ে হাতে সুট-কেসটি ঝুলিয়ে।

শীতের রাত্রিশেষ।

দিল্লীর কনকনে হাড়কাঁপানো শীত। হনহন করে হাঁটতে লাগল

বৈশালী। দ্রুত হেঁটে চলে, পিছনপানে একটিবারও ফিরে তাকায় না।

আবার পথ।

বাসে চেপে পরের দিন সন্ধ্যার দিকে বৈশালী এসে পৌঁছল হরিদ্বার।

হরিদ্বারে দিন দুই থেকে চলে এলো কাশী।

কাশীতেই আবার প্রদ্যুম্ন সান্ন্যালের সঙ্গে একদিন রাস্তায় দেখা।

মিসেস চৌধুরী, আপনি কাশীতে!

হ্যাঁ, মাসখানেক আছি এখানে।

তা হঠাৎ অমন করে মাতাজীর আশ্রম ছেড়ে চলে এলেন কেন?

ভাল লাগল না।

মাতাজী এখনো আপনার কথা বলেন।

ছয়

শেষ পর্যন্ত একটা গানের স্কুলেই চাকরি নিল বৈশালী।

যোগাযোগটা করিয়ে দিয়েছিল অবিশ্যি প্রদ্যুম্ন সান্ন্যালই। মাতৃ-মন্দির সঙ্গীত শিক্ষাসদন। ভেলুপুরার মাঝামাঝি জায়গাটা, একটু গলির মধ্যে।

অনেকদিনের পুরাতন শিক্ষাসদনটি।

গভর্নিং বডির মধুকর শর্মাকে চিনতো প্রদ্যুম্ন, তাকে বলতেই কাজটা হয়ে গেল। অবিশ্যি তারাও অনেক দিন ধরে রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিক্ষা-দানের জন্য একজন ভাল শিক্ষক বা শিক্ষিকার সন্ধানে ছিল, কিন্তু তেমন কাউকে ওরা পাচ্ছিল না।

মাইনের কথা বলতে বৈশালী বলেছিল, আমার এখানে থাকা-খাওয়া চলে যেতে পারে সেটুকু হলেই যথেষ্ট।

দীর্ঘ দেড় বৎসর পরে আবার গানের মধ্যে ফিরে গিয়ে বৈশালীও যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস নিল। সে যে দুঃসহ এক অস্থিরতার মধ্যে ছট্‌ফট করছিল তা থেকে যেন মুক্তি পেল। নতুন করে আবার গানের মধ্যে

নিজেকে ঢেলে দিয়ে বৈশালী যেন নিজেকে ফিরে পেল।

শিক্ষাসদনে কিন্তু বৈশালী তার আসল নামটি দেয় নি, নাম দিয়েছিল অনুরাধা চৌধুরী। প্রত্যুম্ন সান্যালও কর্তৃপক্ষকে ঐ নামটিই বলেছিল।

তা হলেও বৈশালী কি ভুলতে পেরেছিল মানবকে! ভুলতে পেরেছিল কি পুত্র সৌগন্ধকে! কাজের অবসরে যখনই সে নির্জনে নিজের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াত, সন্তান আর স্বামী যেন এসে তার সামনে দাঁড়াত।

দিন মাস বৎসর কেটে যেতে লাগল।

মধ্যে মধ্যে প্রত্যুম্ন আসতো।

প্রত্যুম্ন শুধাতো, কেমন আছো?

বৈশালী হেসে বলতো, মন্দ কি, ভালই তো!

কিন্তু ভুলতে কি পেরেছো তোমার অতীত জীবনকে?

না, ভুলি নি। তাহাড়া ভুলতেও তো আমি চাই না।

তোমার স্বামী, তোমার সন্তানের কথা জানতে ইচ্ছা যায় না?

না।

জানতে চাও না?

না। তারা সুখে থাক, তাহলেই হলো।

মুখে ঐ কথা বললে কি হবে, সে ভাবত খোকন এখন তের-চোদ্দ বছরের হয়েছে—তার মায়ের কথা কি তার মনে পড়ে না!

কোন প্রশ্নই কি সে তার বাপকে করে না!

কলকাতা ছেড়ে চলে আসার পনের বৎসর বাদে এক আকস্মিক ঘটনায় মাতা-পুত্র পরস্পরের সম্মুখীন হলো।

সৌগন্ধ তখন তরুণ যুবক, হায়ার সেকেণ্ডারী পাস করে সৌগন্ধ তখন মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছে। সেই সঙ্গে গানের জগতেও পেয়েছে একটা প্রতিষ্ঠা।

পূজার পর তিন বন্ধুতে মিলে বেড়াতে এসেছিল বেনারস।

সেদিন তখন সন্ধ্যা নামছে।

তিন বন্ধু বসেছিল দশাশ্বমেধ ঘাটে একটা সিঁড়ির উপর—একটা নির্জন অংশে।

রামানুজ, অশেষ ও সৌগন্ধ।

তারই ঠিক হাত দশেক দূরে ঐ সিঁড়ির অন্য এক নির্জন অংশে বসেছিল বৈশালী। কাশীতে ঐ সময় থেকেই সন্ধ্যায় অল্প অল্প ঠাণ্ডা পড়ে।

গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে বসে ছিল বৈশালী।

হঠাৎ তার কানে এল সুললিত কণ্ঠে একটা আবৃত্তি।

জীবনের সুখগুলি ফুলের মতন
ছিন্ন করে নিয়ে মালা করেছ গ্রন্থন
একখানি সূত্র দিয়ে; যাবার বেলায়
সে মালা নিলে না গলে, পরম হেলায়
সেই সূক্ষ্ম সূত্রখানি দুই ভাগ করে
ছিঁড়ে দিয়ে গেলে।

আশ্চর্য উদাত্ত কণ্ঠস্বর! বৈশালা দু' কান খাড়া করে শোনে সুললিত কণ্ঠের আবৃত্তি। এত আবেগ এত মাধুর্য ইতিপূর্বে কারো কণ্ঠস্বরে বুঝি শোনে নি বৈশালী! তীরের কাছে যে নৌকোগুলো বাঁধা তার ফাঁকে ফাঁকে পুণ্যার্থীরা গঙ্গাবক্ষে ছোট ছোট মাটির প্রদীপ ভাসিয়ে দিয়েছে, প্রদীপের শিখাগুলো মৃদুমন্দ বায়ুতে থিরথির করে কাঁপছে যেন ভীরু সংকুচিত প্রণামের মত।

হঠাৎ ঐ সময় কানে এলো একটি কণ্ঠস্বর সান্ধ্য-স্তব্ধতার মধ্যে, সৌগন্ধ, এই সৌগন্ধ—

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতই যেন নামটা শুনে চমকে ওঠে বৈশালী।

কে? ঐ নাম ধরে এইমাত্র কে কাকে ডাকল!

সারাদেহ কাঁপছে তখন বৈশালীর থরথর করে।

সৌগন্ধ! সৌগন্ধ!

এ যে তার খোকনের নাম। তবে কি তার খোকন—

একটা গান গা না ভাই সৌগন্ধ !

জবাব এলো, গান ?

হ্যাঁ, গান।

এই গঙ্গার ধারে ?

তাতে কি, গা না ভাই !

চল্ হোটেলে—হোটেলে গিয়ে গাইবো'খন।

না—এখানে একটা গান গা। অন্য একজন বললে।

সৌগন্ধ বন্ধুদের অনুরোধ বোধ হয় উপেক্ষা করতে পারে না। সে গান ধরে ঃ

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে
এ জীবন পুণ্য কর—দহন দানে।
আমার এই দেহখানি তুলে ধর,
তোমার ঐ দেবালয়ে প্রদীপ কর।

সৌগন্ধ গান গাইছে।

সৌগন্ধ তাহলে গান গায়! মন্ত্রমুগ্ধের মতই যেন উঠে দাঁড়ায় বৈশালী। এবং এক দুর্বার আকর্ষণে কখন যে পায়ে পায়ে আবছা আলো-আঁধারের মধ্যে ওদের তিন বন্ধুর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে বৈশালী নিজেও বুঝি তা বুঝতে পারে নি।

আবছা আবছা আলো-আঁধারির মধ্যে গঙ্গার ঘাটের প্রশস্ত সিঁড়ির উপরে বসে পাশাপাশি নিবিড়ভাবে তিন বন্ধু পিছন ফিরে।

সৌগন্ধ তখনো গাইছে।

বৈশালী বুঝতে পারে না ঝাপসা আলো-আঁধারির মধ্যে ওদের মধ্যে কে গান গাইছে—কে ওদের মধ্যে তার নাড়ীছেঁড়া ধন সৌগন্ধ, খোকন ?

গান শেষ হলো। একজন বললে, চল্—এবারে হোটেলে ফেরা যাক।

তিনজনেই উঠে দাঁড়াল যাবার জন্য।

স্থান কাল সব কিছু ভুলে গিয়ে হঠাৎ মৃদু কণ্ঠে ডাকলো বৈশালী, সৌগন্ধ !

কে ? মধ্যের জন বললে।

সৌগন্ধ—

সৌগন্ধ তাকাল বৈশালীর দিকে।

সৌগন্ধ দু' পা এগিয়ে এলো, কে আমাকে ডাকল?

আমি।

সৌগন্ধ আরো দু' পা এগিয়ে আসে—আপনি?

হ্যাঁ, আমি।

আপনাকে তো আমি চিনতে পারলাম না?

বৈশালী বললে, না, তুমি আমাকে চিনতে না সৌগন্ধ।

আপনি আমাকে চেনেন? সৌগন্ধ বেশ যেন একটু কৌতূহলের সঙ্গে প্রশ্নটা করে বৈশালীর মুখের দিকে তাকাল।

চিনি—কথাটা যেন ফিসফিস করে বৈশালী উচ্চারণ করে।

চেনেন—আপনি আমাকে চেনেন?

ওরা কথা বলতে বলতে একটু এগিয়ে এসেছিল সকলে। সামনের একটা দোকানের উজ্জ্বল আলোর খানিকটা বৈশালীর চোখেমুখে পড়ায় তাকে অনেকটা স্পষ্ট দেখা যায়।

পরনে লালপাড়ের একটা তাঁতের শাড়ি। মাথায় কপাল-ঢাকা ঘোমটা। সিঁথিতে সিঁদুর।

চোখে চশমা, সোনার সরু ফ্রেমের।

রগের দু'পাশের চুলে পাক ধরেছে বোঝা যায়।

আশ্চর্য, কেন যেন সৌগন্ধর ঐ মুখখানা চেনা-চেনা লাগে! কিন্তু মনে করতে পারে না কোথায় কবে দেখেছে ওকে? কিংবা কোন পরিচিত জনের কেউ কিনা!

কি দেখছো সৌগন্ধ আমার মুখের দিকে চেয়ে? বৈশালী ভীরু গলায় প্রশ্ন করে।

আপনাকে যেন কেমন চেনা-চেনা লাগছে। সৌগন্ধ বললে, অথচ ঠিক চিনে উঠতে পারছি না।

চেনা-চেনা লাগছে আমাকে?

হ্যাঁ। কিন্তু আপনি যে বললেন এইমাত্র, আপনি আমাকে চেনেন

—সত্যি কি আপনি আমাকে চেনেন ?

চিনি। এবার বৈশালীর কণ্ঠস্বর স্পষ্ট। কণ্ঠস্বরের মধ্যে কোন দ্বিধা বা জড়িমা নেই।

আপনি কি আমাদের পরিচিত জনের কেউ ?

না।

কোন দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়া ?

না।

আপনি আমার বাবাকে চেনেন ?

এককালে চিনতাম তোমার বাবাকে।

এককালে চিনতেন !

হ্যাঁ। অবিশ্যি অনেক কাল দেখা হয় না, আজ হয়ত তিনি আমাকে চিনতেও পারবেন না।

হঠাৎ ঐ সময় প্রশ্ন করে বসে সৌগন্ধ, আপনি কি আমার মাকে চেনেন ?

মা !

হ্যাঁ—আমার মা ?

চিনতাম।

চিনতেন ? আমার মাকে চিনতেন আপনি ?

হ্যাঁ। তুমি বুঝি কাশীতে বেড়াতে এসেছো ?

ফার্স্ট এম. বি. পরীক্ষা হয়ে গেছে, তাই কজনে আমরা এখানে দিনকয়েকের জন্য বেড়াতে এসেছি।

তুমি ডাক্তারী পড় ?

হ্যাঁ।

বৈশালীর দু' চোখের কোল ছাপিয়ে জল আসছিল। সে আর দাঁড়াল না, তাড়াতাড়ি স্থানত্যাগ করবার জন্য পা বাড়ায়।

সৌগন্ধ একটু যেন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল, কোন কথাই তার মুখ দিয়ে বের হয় না। কিন্তু হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে আসায় দেখলো বৈশালী সামনের গলিটার মধ্যে দ্রুতপায়ে ঢুকছে।

সৌগন্ধ তাড়াতাড়ি বলে বন্ধুদের, তোরা একটু দাঁড়া, আমি আসছি।

সৌগন্ধ দ্রুতপায়ে বৈশালীকে অনুসরণ করে। কিন্তু তাকে ধরতে পারে না। তার আর নাগাল পায় না।

তারপর আরো দুটো দিন সৌগন্ধরা কাশীতে ছিল এবং তন্নতন্ন করে বৈশালীকে খুঁজেছে বাঙালীটোলার সর্বত্র, কিন্তু কোথায়ও আর বৈশালীর দেখা পায় নি।

বুকের মধ্যে একটা আনন্দ ও বেদনার ঝড় নিয়ে বৈশালী ফিরে এলো বাসায়।

ভেলুপুরারই একটা সরু গলির মধ্যে এক প্রৌঢ়া বিধবার বাড়ির দুটো ঘর নিয়ে থাকত বৈশালী। প্রৌঢ়া আনন্দময়ী তার বাড়ির একতলাটা ভাড়া দিয়েছিলেন। দোতলার চারখানি ঘরের দু'খানা ঘরে তিনি থাকতেন আর দু'খানি ঘর ভাড়া দিয়েছিলেন বৈশালীকে। আনন্দময়ীও তখন বৈশালীকে পেয়ে বেঁচে গিয়েছিলেন, তেমনি বৈশালীও আনন্দময়ীর গৃহে আশ্রয় পেয়ে যেন নিশ্চিন্ত হয়েছিল।

আনন্দময়ীর সংসারে এক পুত্র—সে দিল্লীতে বড় চাকরি করে, মা কাশীবাসিনী হতে চান বলে কাশীতে ঐ বাড়িটা মায়ের নামে কিনে দিয়েছিলেন।

বাড়িভাড়া থেকে মা যা পান তাতেই তাঁর চলে যায়।

ঐ বাড়ির এবং আনন্দময়ীর সন্ধানও দিয়েছিল বৈশালীকে প্রদ্যুম্ন সান্যাল। সম্পর্কে প্রদ্যুম্নর পিসী হন আনন্দময়ী।

পুত্র তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা দিল্লীতে থাকলেও তারা মায়ের নিয়মিত খোঁজখবর নিত ; মধ্যে মধ্যে একদিনের জন্য এসে ছেলে মাকে দেখেও যেত।

কিন্তু আনন্দময়ী বলতেন, কেন ছুটে ছুটে আসিস বাবা! আমি তো বেশ ভালই আছি।

ছেলে বলতো, কোথায় দিল্লী আর কোথায় এই কাশী! আমার যে

বড় চিন্তা হয় মা, তাছাড়া একা একা থাক।

ভাড়াটেরা আমার দেখাশোনা করে, খোঁজখবর নেয়। হঠাৎ কিছু হলে একটা খবর ঠিকই পাবি।

আমার আসতে তো কোন কষ্ট হয় না মা। ছেলে বলতো।

মায়ের সঙ্গে স্ত্রী প্রতিমার কোন মতানৈক্য ছিল না, তবু মা ছেলের সংসারে থাকলেন না। কাশীবাসের কথা তুলতেই তাই ছেলে বলেছিল, কেন মা কাশীতে গিয়ে থাকতে চাও তুমি? এখানে কি তোমার কোন অসম্মান বা অসুবিধা হচ্ছে?

না বাবা, আমার বৌমার মত মেয়ে হয় না।

তবে যেতে চাও কেন?

এই তো ওর সংসার করবার সময়, ওর সংসারে ও একচ্ছত্র একেশ্বরী হয়ে থাক তাই আমি চাই। আমি সংসারের মধ্যে থাকলে তা ঠিক হবে না।

কেন হবে না?

হয় না রে—হয় না। শাশুড়ীকে সংসারের সব ভার পুত্রবধূর হাতে নিঃস্বার্থভাবে তুলে দিতে হয় যেটা শাশুড়ী সংসারের মধ্যে থাকলে হয় না।

তোমার বৌ কি তোমাকে কিছু বলেছে?

অমন মিথ্যা বললে নরকেও আমার স্থান হবে না। আমি হাসি মুখেই এখান থেকে চলে যেতে চাই।

কি জানি কেন—পুত্র আর প্রতিবাদ জানায় নি।

সে মায়ের কাশীবাসের সমস্ত ব্যবস্থা করে দিয়েছিল: এবং দেখা গেল মায়ের ব্যবস্থাটা ভালই হয়েছে।

শাশুড়ী-পুত্রবধূর মধ্যে সম্পর্কটা আরো নিবিড় হয়েছে।

আনন্দময়ী একাই কাশীর বাড়িতে দিন কাটাতে লাগলেন। পূজা-আর্চা, গঙ্গাস্নান, বিশ্বনাথ দর্শন, গীতা, ভাগবত পাঠ শোনা—এক রকম বেশ কেটে যাচ্ছিল। দোতলার দুটো ঘর তাঁর ভাড়া দেওয়ারও ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্র প্রত্যুম্নর অনুরোধে বৈশালীকে ঘর দুটো ভাড়া

না দিয়ে পারেন নি। প্রত্যুম্ন চেয়েছিল বৈশালীর একটা নিশ্চিন্ত আশ্রয় তার সব কথা জানার পর।

বৈশালীকে ভালই লাগল আনন্দময়ীর।

বিশেষ করে মধ্যরাত্রে ও ভোরবেলা কোন কোন দিন বৈশালী যখন তানপুরাটা নিয়ে গান গাইত তার সুললিত মধুর কণ্ঠে। সে গান শুনতে আনন্দময়ীর বড় ভাল লাগত।

গান শুরু হলেই তিনি এসে বৈশালীর ঘরে বসতেন।

নিঃশব্দে একপাশে বসে তার গান শুনতেন।

আনন্দময়ীর মনে হতো ঐ মেয়েটির বুকের মধ্যে কোথায় যেন একটা জমাট দুঃখ সঞ্চিত হয়ে আছে। তার গান, না তার গুমরে গুমরে কান্না। কিন্তু আনন্দময়ী বৈশালীকে কোন দিন কোন কথা শুধান নি।

সাত

বেশ একটু দ্রুত পদেই দীর্ঘ গলিপথটা অতিক্রম করে বৈশালী বাসায় ফিরে এলো।

অনেক—অনেক দিন পরে বেশ মনে পড়েছে তার, সে মা। সে সন্তানের মা।

যে সন্তানকে ছেড়ে আসতে একদিন তার বুক ভেঙে গিয়েছিল এবং স্বামীর উপরে নিদারুণ একটা অভিমানে যে সন্তানের স্মৃতিমাত্র বৈশালীর মনের মধ্যে এত বছর ধরে কেবল রক্ত ঝরিয়েছে আজ সেই সন্তান তার স্মৃতির যবনিকাখানি সরিয়ে দিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

আর তাই বুঝি তার এতদিনকার সঞ্চিত বাঁধটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়েছে।

দীর্ঘ এক যুগ পরে যেন পুত্র তাকে হঠাৎ সামনে এসে স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেল—সে তার মা।

কি ক্ষতি হতো যদি আজ বৈশালী পুত্রকে তার নিজের পরিচয়টুকু দিতো। বলতো. আমি তোর মা খোকন!

কিন্তু কেন দিতে পারলো না পরিচয়টা, ভয়ে কি? না ছেলের প্রতি নিদারুণ একটা অভিমান?

ডিভোর্সের সময় ছেলে আসতে চায় নি মায়ের সঙ্গে। সে বলেছিল সে তার বাপের কাছেই থাকবে। সেই ছেলে আজ যদি যেচে সে তার পরিচয় দেবার পর বলতো, তুমি আমার মা নও, তোমাকে আমি আমার মা বলে স্বীকার করি না।

তবে—তবে সে কি করতো?

তাব সেই লজ্জা কেমন কবে সে ঢেকে বাখত?

না, না—তার চাইতে এই ভাল হলো।

নিষ্ঠুর এক অপরিচয়ের তমসাব দু' ধারেই তারা থাক।

অন্ধকাব ঘরের মধ্যে চুপটি করে ভূশয্যার উপর বসেছিল বৈশালী। ঘরের আলোটা পর্যন্ত জ্বালায় নি। জ্বালাবার কথা আলোটার মনেও হয় নি তার।

অন্ধকারে তার সমস্ত দৃষ্টি জুড়ে যেন এক জ্যোতির্ময় আনন্দশিখার মত পুত্রের চেহারাটা তার সামনে ভাসছিল।

সেই বালক আজ যুবক হয়েছে। অবিকল যেন তার বাপেরই মত হয়েছে। মানব কি আর এতদিনে আবার বিবাহ করে নি? বিবাহ করে কি নতুন করে আবার সংসার পাতে নি?

তার সংসারের যে চাবিটা আদালতে ছাড়পত্র স্বাক্ষরিত হবার আগে নিঃশব্দে তার স্বামীর বালিশের তলায় রেখে এসেছিল সে চাবিটা কি অন্য এক নারীর অঞ্চল প্রান্তে বেঁধে দেয় নি মানব?

নিশ্চয়ই দিয়েছে—

সৌগন্ধ—খোকনের নতুন মা।

সেটাই তো স্বাভাবিক আর সেটাই তো ধরে নিয়েছিল সে।

সে-সংসার থেকে মুছে গিয়েছে আজ চিরদিনের মত বৈশালীর নাম।

বৈশালী আজ আর খোকনেরও কেউ নয়।

অনুরাধা!

আনন্দময়ীর ডাকে চমকে ওঠে বৈশালী।

আলো জ্বালোনি, এত রাত হলো—

আসুন মা।

কি হলো গো মেয়ের? আজ কি আর মেয়ের গান হবে না? আনন্দময়ী ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন। আনন্দময়ী নিজেই অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে ঘরের আলোর সুইচটা টিপে দিলেন।

অন্ধকার ঘর আলোকিত হলো।

ও কি মেয়ে, চুপচাপ এমন করে বসে কেন? আনন্দময়ীর গলায় উৎকণ্ঠা। ঘরের আলোয় আনন্দময়ী দেখেন বৈশালীর দুই গাল অবিরল ধারায় অশ্রুতে ভেসে যাচ্ছে।

কি হয়েছে মেয়ে?

তাড়াতাড়ি অঞ্চল প্রান্তে চক্ষু মার্জনা করে নেয় বৈশালী।

কি হয়েছে মেয়ে? আবার প্রশ্ন করেন আনন্দময়ী।

কিছু হয় নি মা।

কিছু হয় নি বললেই চলবে, বলতে বলতে পাশে এসে বসলেন আনন্দময়ী।

আনন্দময়ী দীর্ঘদিনের পরিচয়ের সূত্রে জানতে পেরেছিলেন বেশালীর করুণ জীবন-কথা।

মা, জানেন আজ দীর্ঘ পনের বৎসর পর খোকনকে দেখলাম। বৈশালী ছলছল চোখে বললে।

তোমার ছেলে?

হ্যাঁ!

কোথায়? কোথায় সে? কোথায় দেখলে তাকে?

এই কাশীতেই। জান মা সে ডাক্তারী পড়ছে।

তাই নাকি! তা নিয়ে এলে না কেন তাকে সঙ্গে করে মেয়ে?

কেমন করে আনবো মা! কোন্ পরিচয়ে বলবো তাকে আসতে?

কোন্ পরিচয় কি আবার। তুমি তার মা, সে তোমার সন্তান। আবার কি পরিচয়।

বলতে পারলাম না মা সে-কথা।

সে কি মেয়ে, কেন গো?

যদি সে আমায় অস্বীকার করে আজ?

পাগলী মেয়ে। ছেলে কি কখনো নিজের মাকে অস্বীকার করে, না তাই কেউ করতে পারে। ঠিক আছে তুমি বলো—আমি এখুনি গিয়ে তাকে নিয়ে আসছি এখানে।

আমি—আমি তো জানি না মা সে কোথায় আছে?

জান না?

না। সে কোথায় উঠেছে বন্ধুদের সঙ্গে আমি জানি না।

জিজ্ঞাসা করো নি?

না।

হ্যাঁরে বোকা মেয়ে—নিজের ছেলেকে সামনে পেয়েও সব কথা জিজ্ঞাসা করলে না?

তুমি তো সব জান মা। আমাদের যখন ডিভোর্স হয়ে যায় সে নাকি জজ সাহেবকে বলেছিল সে তার বাপের সঙ্গেই থাকবে।

সে তো তখন একটা বাচ্চা ছেলে মাত্র, কিই-বা তখন তার বুদ্ধি আর কিই-বা বিবেচনা করবার ক্ষমতা—তাছাড়া তুমিই তো বলেছিলে ছেলে তার বাপের বেশী নেওটা ছিল।

হ্যাঁ মা। স্কুল থেকে যখন ফিরত বেশীর ভাগ দিনই আমি সে সময় বাড়ি থাকতাম না। রেডিও, জলসা, কনফারেন্স—একটা না একটা লেগেই থাকত। যখন বাড়ি ফিরতাম রাত্রে প্রায়ই তখন সে ঘুমিয়ে থাকত।

একটা কথা বলি মা, তুমি অন্যায়ই করেছো। মাকে কাছে না পেয়ে সে স্বাভাবিক ভাবেই তার বাপের দিকে ঝুঁকেছে।

জানি মা। অন্যায় যে করেছি তা আমি বুঝেছি—

আমি একটা কথা বলবো মেয়ে?

কি ?

স্বামী স্ত্রীব সম্পর্ক—ও কি এত সহজেই ছিঁড়ে ফেলা যায়, না তাকে অস্বীকার করা যায় ? ও যে জন্মজন্মান্তরের বাঁধন মেয়ে।

তুমি তো জান মা, আমাদের সে সম্পর্ক শেষ হয়ে গিয়েছে—ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে।

শেষ হয়ে গিয়েছে—ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে—ওসব সাহেবদের দেশেই হয়, এদেশে ওসব চলে না। যতই আইন পাস হোক আর যতই সে-সব নিয়ে সবাই হৈ-চৈ করুক।

মা—

তোমার নিজের মনেব দিকেই তাকিয়ে দেখো মেয়ে—ভুলতে কি পেরেছো আজ পর্যন্ত তোমার স্বামীকে—আইনের দোহাই দিয়ে ছাড়-পত্র নিয়েছো—মন থেকে তো সে পবিত্র বন্ধনকে অস্বীকার কবতে পার নি—জীবনে পারবেও না কোনদিন। আমি বলি কি মেয়ে তুমি ফিরে যাও।

ফিরে যাবো ? কোথায় ?

কেন—তোমাব স্বামীব কাছে।

কি করে তা আর সম্ভব !

কেন সম্ভব নয় ? আমি বলছি সেও হয়ত আজো তোমাকে ভুলতে পারে নি। মন-কষাকষি—ভুল-বোঝাবুঝি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে হয়ই। সংসারে পাশাপাশি থাকতে গেলে অমনটা না হওয়াই বিচিত্র—তাই বলে সেটাই কিন্তু চরম ও শেষ কথা তো নয় মেয়ে। আমার জীবনের কথা তুমি জান না মেয়ে—আমি—

মা—আমাদের কালে তো আর তোমাদের মত ডিভোর্স-টিভোর্স ছিল না—বিয়েব এক বছর পরেই স্বামী আমাকে ত্যাগ করলেন।

ত্যাগ করলেন।

হ্যাঁ। আমাকে বাপের বাড়ি রেখে গেলেন।

তারপর—

বাপের মনোনীতা পাত্রী আমাকে তিনি বিয়ে করেছিলেন—তাঁর

পছন্দ ছিল অন্য আর একজন—তাকেই বিয়ে করলেন—কতই বা বয়স তখন আমার, উনিশ-কুড়ি।

তবে যে শুনেছিলাম আপনার ছেলে এই বাড়ি আপনাকে কিনে দিয়েছেন—

ও তো আমার নিজের ছেলে নয়।

তবে ?

সতীন-পুত্র। কিন্তু ঐ নামেই সতীন পুত্র—আমার নিজের ছেলেই সে—তাকে কোনদিন আমি সতীন-পুত্র বলে ভাবি নি। সেও আমাকে নিজের মার মতই দেখে। আট বছরের ওই ছেলেটিকে রেখে আমার সতীন যখন মারা গেলেন—সংবাদটা পেয়ে আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। স্বামী তখন কানপুরে থাকেন। ছুটে গেলাম সেখানে।

আপনি গেলেন ?

গেলাম বৈ'ক। স্বামীর অত বড় বিপদের সংবাদ পেয়েও যাবো না!

আপনার স্বামী—

তাড়িয়ে দেন নি বুঝতেই পারছো। তাছাড়া স্বামীই আমাকে ত্যাগ করেছিলেন, আমি তো আর তাঁকে ত্যাগ করি নি। আমাকে দেখে উনি আমার হাত ধরে বললেন, আনন্দময়ী—আমাকে ক্ষমা করো। তাই বলছিলাম মেয়ে—তুমি ফিরে যাও—

বৈশালী চুপ করে থাকে।

আনন্দময়ী বললেন, কি ভাবছো মেয়ে? তুমি একা না যেতে পারো চলো আমি তোমাকে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসবো।

না মা—যদি কোনদিন যেতে পারি তো নিজেই যাবো।

বের হয়ে আসাটা চিরদিনই সহজ মেয়ে—আনন্দময়ী মৃদু কণ্ঠে বললেন। যদি সত্যিই কোনদিন ফিরে যেতে পারো তো দেখবে সেই কঠিনের মধ্যেও আছে একটা প্রচণ্ড জয়ের আনন্দ। হারাবার বেদনাটা দেখবে সেদিন ফিরে পাওয়ার আনন্দের মধ্যে এক হয়ে মিশে গিয়েছে।

কথাগুলো বলে আনন্দময়ী আর দাঁড়ালেন না—ধীরে ধীরে কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

বৈশালী যেমন বসেছিল তেমনিই বসে রইলো।

মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন নিয়ে সৌগন্ধ বন্ধুদের সঙ্গে হোটেলে ফিরে এলো। মনের মধ্যে প্রশ্নটা তখন তার রীতিমত তোলপাড় করছে।

রামানুজ বললে, ভদ্রমহিলাকে তুই চিনতে পারলি না সৌগন্ধ?

অশেষ বললে, চিনতে পারলে কি আর ও বলতো না রে?

রামানুজ আবার বললে, ভদ্রমহিলা তো বললেন, সৌগন্ধর মাকে উনি চিনতেন, হয়ত ওর মায়ের কোন বান্ধবী।

অশেষ বললে, হয়ত ছোটবেলার বান্ধবী। সৌগন্ধর মা তো কবেই মারা গেছেন।

কথাটা সৌগন্ধর মনের মধ্যে যেন একটা ধাক্কা খেল সহসা।

বন্ধুরা অবিশ্যি সবাই জানে সৌগন্ধর মা মারা গেছেন অনেক দিন আগে, যখন ও স্কুলে পড়ে।

ওদের কোন দোষ নেই।

সৌগন্ধও অবিশ্যি মনে মনে বিশ্বাস করতো তার মা আর বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলে কি তার মায়ের মত অমন একজন প্রখ্যাতা সঙ্গীতশিল্পীর সন্ধান পাওয়া যেত না!

বাবা তাকে মুখে কোনদিন নাই বলুন, সৌগন্ধ বড় হয়ে বেশ বুঝতে পেরেছিল—তার বাবা আজো তার মাকে ভুলতে পারে নি—আর সেই কারণেই তার বাবা তার মায়ের অনুসন্ধান অনেক করেছে।

কিন্তু মায়ের কোন সন্ধানই পাওয়া যায় নি।

মানব অবিশ্যি মুখে তাঁর স্ত্রীর নামও উচ্চারণ করতেন না কখনো, কিন্তু মুখে কথাটা উচ্চারণ না করলেও সৌগন্ধ জানত মায়ের জন্য তার বাবার আজো শবরীর প্রতীক্ষা চলেছে।

মানব এক সময় বাড়ির মধ্যে স্ত্রীর যাবতীয় ছবি সরিয়ে ফেলেছিল। কেবল একটা ছবি মায়ের সৌগন্ধ লুকিয়ে নিজের কাছে সযত্নে রেখে দিয়েছিল।

ছবিটা কখনো সৌগন্ধ কাছছাড়া করে নি।

যখন যেখানে যেতো ছবিটা তার সুটকেশের মধ্যেই থাকতো লুকানো। আজ সেই লুকানো ফটোটার কথাই মনে পড়ে সৌগন্ধর।

আশ্চর্য! সৌগন্ধর মনে হচ্ছিল মায়ের সেই ছবিটার সঙ্গে যেন গঙ্গার ঘাটে দেখা ভদ্রমহিলার মুখের চেহারার বিচিত্র একটা মিল আছে।

আর তাই ভদ্রমহিলাকে দেখে তার মনে হয়েছিল—ভদ্রমহিলার মুখখানা যেন চেনা চেনা।

হোটেলে ফিরে এসেই ঘরের আলো জ্বালিয়ে সুটকেস খুলে সৌগন্ধ ফটোটা বের করে চোখের সামনে ধরে।

আশ্চর্য! অদ্ভুত মিল তার মায়ের মুখের সঙ্গে! এবং যত ফটোটা দেখে ততই যেন তার ধারণা বদ্ধমূল হয়। তবে কি—তবে কি তার মা?

মা।

রামানুজ জিজ্ঞাসা করে, কি দেখছিস রে? ওটা কার ফটো?

সৌগন্ধ বন্ধুর প্রশ্নের কোন জবাব দেয় না। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

কোথায় চললি?

আসছি—

সৌগন্ধ দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

ছুটে গেল দশাশ্বমেধ ঘাটে। ঘাট তখন প্রায় নির্জন, এবং যে গলির মধ্যে বৈশালী প্রবেশ করে দৃষ্টির বাইরে চলে গিয়েছিল সেই গলির মধ্যে ঢুকে তন্নতন্ন করে খুঁজতে লাগল—কিন্তু কোথায় পাবে সে তখন বৈশালীকে!

বৈশালী তো তখন ভেলুপুরায় তার বাসায়।

প্রায় ঘণ্টাখানেক এ-গলি সে-গলি করে সৌগন্ধ আবার ফিরে এলো দশাশ্বমেধ ঘাটে। ঘাট তখন প্রায় নির্জন।

এখানে ওখানে দু-একটা নৌকোয় আলো জ্বলছে।

দূরে মণিকর্ণিকার ঘাটে গোটা তিনেক চিতা জ্বলছে। নিশীথের গঙ্গার কালো জলে সেই চিতার আগুনের রক্তাভা কাঁপছে।

মাথার উপর আকাশ—

কালো আকাশ। হাজারো তারকার বাতি মিটিমিটি জ্বলছে।

মা—মাকে এত দিন পরে পেয়েও সে হারাল।

হতভাগা সে। এত বছর পরে মা তার সামনে এসে দাঁড়াল—নাম ধরে ডাকলো—আর সে মাকে চিনতে পারল না।

অনেক রাত্রে পা টিপে টিপে হোটেলের ঘরে এসে ঢুকল সৌগন্ধ।

অশেষ ঘুমিয়ে পড়লেও রামানুজ তখনো ঘুময় নি—বন্ধুর অপেক্ষায় জেগে বসেছিল। সৌগন্ধকে ঘরে ঢুকতে দেখে প্রশ্ন করে, কোথায় ছিলি এত রাত পর্যন্ত?

সৌগন্ধ যেন কেমন অসহায় বোবা দৃষ্টিতে বন্ধুর মুখের দিকে তাকালো।

কি হয়েছে রে সৌগন্ধ?

রামানুজ—

কি?

যিনি আজ সন্ধ্যায় গঙ্গার ঘাটে আমার সঙ্গে কথা বললেন—

চিনতে পেরেছিস?

হ্যাঁ।

কে?

আমার মা।

তোর মা? তোর মা তো কবে তোর ছোটবেলাতেই—

না—মা মরে নি।

মরেন নি?

না। মা-বাবার ডিভোর্স হয়ে যায় দশ বছর আগে।

ডিভোর্স!

হ্যাঁ। আর ডিভোর্সের পর আদালত থেকে মা যেন কোথায় চলে যান—সবাই জানে মা মারা গেছেন অনেক দিন আগে। এত দিন মার কোন সন্ধান আমরা পাই নি।

হ্যাঁরে সৌগন্ধ—তুই ঠিক চিনতে পেরেছিস তো—তোর মা?

হ্যাঁ, এই ফটোটা দেখ্—বলতে বলতে সৌগন্ধ জামার পকেট থেকে

একটা কিছুটা লালচে হয়ে যাওয়া ফটো বের করে বন্ধুর হাতে দিল।

রামানুজ ফটোটা মনোযোগের সঙ্গে দেখে। তারপর মৃদু গলায় বললে, সত্যিই তো ভদ্রমহিলার মুখের আদলের সঙ্গে অনেকটা মিল আছে।

ওটা মার বারো বছর আগেকার ফটো রামানুজ। তাহলেও বুঝতে কষ্ট হয় না—

তোর মা তাহলে কাশীতে আছেন—

তাই তো দেখছি—

চল্, কাল আবার গঙ্গার ঘাটে যাবো—তাঁর সন্ধান করবো। কালকের ফেরার টিকিট ক্যানসেল করে দিতে বলগে অশেষকে।

তারপর দু'দিন কেন—তিন তিনটে দিন ওরা দুই বন্ধুতে মিলে তন্ন-তন্ন করে কাশীর ঐ মহল্লা খুঁজে বেড়াল বৈশালীকে। কিন্তু কোথায়ও তার দর্শন পেল না।

বৈশালীও তো ভেবেছিল পরের দিন আবার গঙ্গার ঘাটে যাবে কিন্তু তার যাওয়া হয় নি—ঐ দিনই শেষ রাত্রের দিকে প্রচণ্ড কাঁপুনি দিয়ে তার জ্বর এলো।

তারপরই অজ্ঞান।

অজ্ঞানের মধ্যে কেবল মধ্যে মধ্যে বিড়বিড় করে অস্ফুটভাবে বলেছে, খোকন—আমার খোকন।

আনন্দময়ী রীতিমত বিপদে পড়তেন বৈশালীকে নিয়ে, যদি না হঠাৎ পরের দিন দুপুরের দিকে তার ভ্রাতুষ্পুত্র প্রদ্যুম্ন সান্যাল না এসে হাজির হতো।

সে মধ্যে মধ্যে আসতো পিসীর বাড়ি।

প্রদ্যুম্নই তখন বৈশালীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করে।

আট

দীর্ঘ পনের দিন একটানা জ্বরের পর ষোল দিনের দিন জ্বর ছাড়লো বৈশালীর।

বৈশালী তখন একেবারে শয্যার সঙ্গে যেন লেগে গিয়েছে।

জ্ঞান হবার পর বৈশালী ধীরে ধীরে গত পনের ষোল দিনের ইতিহাস সবই জানতে পারল। শুধু তাই নয়—প্রত্যুম্ন সান্ন্যাল সম্পর্কে যে ব্যাপারটা ছিল কিছুটা অস্পষ্ট, কিছুটা ঝাপসা ঝাপসা এবং যেটা একটা সন্দেহের আকারে মধ্যে মধ্যে তার মনকে ছুঁয়ে গিয়েছে সেটা যেন স্পষ্ট হয়ে গেল।

প্রত্যুম্ন সান্ন্যালের চোখ মুখ—সব কিছু যেন স্পষ্ট করে তাকে জানিয়ে দিল।

প্রত্যুম্ন সান্ন্যাল সেই যে এসেছে—আর যায় নি।

ডাক্তার ডাকা—ঔষধ খাওয়ানো—পথ্য খাওয়ানো সব করেছে। রাতের পর রাত বিনিদ্র কাটিয়েছে বৈশালীর শিয়রে বসে।

সেদিন দুপুরের দিকে আনন্দময়ী তখনো বিশ্বনাথের মন্দির থেকে ফেরেন নি, ফিরতে তাঁর প্রায় প্রত্যহ দুটো-আড়াইটে হয়।

বৈশালী শয্যার উপর শুয়ে ছিল বালিশে মাথা দিয়ে—পশ্চিমের খোলা জানলাটা দিয়ে খানিকটা আকাশ চোখে পড়ে।

নীল আকাশের বুকে কিছু ভাসমান এলোমেলো সাদা মেঘ, কয়েকটা চিল পাক খাচ্ছে। বড় রাস্তার গোলমাল মধ্যে মধ্যে কানে আসে।

কিছু দূরে একটা ইজিচেয়ারে বসে প্রত্যুম্ন—পরনে পায়জামা আর গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি—মুখের সামনে একটা মোটা বই খুলে পড়ছে প্রত্যুম্ন।

হঠাৎ বইটা মুখের সামনে থেকে নামিয়ে প্রত্যুম্ন বৈশালীর দিকে তাকাল।

ঘুম ভেঙে গেল—প্রত্যুম্ন বললে, দাঁড়াও তোমার ফলের রস খাবার সময় হয়েছে।

মা ফেরেন নি এখনো?

না, পিসীমা এখনো ফেরেন নি—উঠে দাঁড়িয়ে বললে প্রত্যুম্ন।

প্রত্যুম্ন বেদানার রস করতে থাকে সামনের টেবিলটার কাছে গিয়ে

—বৈশালী একদৃষ্টে মানুষটাকে দেখতে থাকে।

প্রত্যুম্নর অনেক মাথার চুল পেকে গিয়েছে, সেই ঘন কালো চুল তো আর নেই। কিন্তু শরীরটা এখনো ঋজু বলিষ্ঠ আছে।

প্রত্যুম্ন একটা কাপে করে বেদানার রস নিয়ে বৈশালীর শয্যার পাশে এসে দাঁড়াল—বৈশালী তখন উঠে বসেছে খাটের উপর।

নাও—এই বেদানার রসটা খেয়ে নাও অনুরাধা। প্রত্যুম্ন কাপটা এগিয়ে ধরে বললে।

না—আপনি আর আমাকে অনুরাধা বলে ডাকবেন না প্রত্যুম্নবাবু।

তবে কি নামে ডাকবো ?

বৈশালী বলে ডাকবেন।

প্রত্যুম্ন যেন একটু বিস্মিতই হয়—এক সময় বৈশালীই তাকে অনুরোধ জানিয়েছিল বৈশালী নামটা সে ভুলে যেতে চায়, মন থেকে মুছে ফেলতে চায়—তাকে যেন প্রত্যুম্ন অনুরাধা বলেই ডাকে।

বৈশালী বললে, অনুরাধা তো সত্যিই আমার নাম নয়—আমার নাম তো বৈশালী।

কিন্তু তুমিই তো একদিন বলেছিলে—

হ্যাঁ বলেছিলাম—তখন বুঝতে পারি নি—

কি ?

এ-জন্মে বৈশালী বৈশালীই থেকে যাবে—বৈশালীই হয়ে থাকতে হবে তাকে—কোনদিনই সে অনুরাধা হতে পারবে না। তারপর একটু থেমে বললে, আপনি আজই চলে যান প্রত্যুম্নবাবু।

চলে যাবো আজই ?

হ্যাঁ। আমাকে বৈশালী হয়ে থাকতে দিন বাকী জীবনটা।

তুমি তো তাই আছো অনুরাধা—শান্ত গলায় বললে প্রত্যুম্ন।

না। তুমি সামনে থাকলে—অনুরাধা বৈশালীকে বৈশালী হতে দেবে না। কথাটা নিজের মনে মনেই বললে বৈশালী।

নাও—রসটা খেয়ে নাও।

রস এখন খাবো না, রেখে দিন। কিন্তু কই আমার কথার তো জবাব

দিলেন না।

কোন্ কথার? প্রদ্যুম্ন তাকাল বৈশালীর মুখের দিকে।

আমি যে বললাম আপনাকে আজই চলে যেতে। যাবেন তো?

তুমি আর একটু সুস্থ হয়ে ওঠো—

না। আমি যথেষ্ট সুস্থ হয়েছি। দয়া করে আর আমার ঋণের বোঝা বাড়াবেন না প্রদ্যুম্নবাবু।

প্রদ্যুম্ন কোন জবাব দেয় না, কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে। তারপর শান্ত গলায় বললে, তুমি ঠিকই বলেছো অনুরাধা, সত্যিই বোধহয় এখানে আর আমার থাকা উচিত নয়।

বৈশালী প্রত্যুত্তরে কোন কথা বলে না। মাথাটা নীচু করে পাথরের মত শয্যার উপরে বসে থাকে।

প্রদ্যুম্ন পূর্ববৎ শান্ত ধীর গলায় বললে, যাবার আগে আজ আর কোন কথাই আমি গোপন করবো না অনুরাধা। তোমাকে দেখার তৃষ্ণা বোধহয় জীবনে আমার শেষ দিন পর্যন্ত মিটবে না। না, না—বাধা দিও না, আমাকে বলতে দাও অনুরাধা। তোমার দেহটাকে, বিশ্বাস করো, কোন দিনই আমি চাই নি—তবে তুমি অত ভয় পেলে কেন? দেহের অতীত যে তুমি তাকেই মনে মনে আমি কামনা করেছি চিরদিন।

আমি অন্য একজনের স্ত্রী—শান্ত গলায় বললে বৈশালী।

কার স্ত্রী তুমি আমি তা জানতে চাই না—জানবারও কোন প্রয়োজন দেখি না অনুরাধা—তুমি আমার কাছে কেবল অনুরাধা।

ও-কথা শোনা তো আমার পাপ প্রদ্যুম্নবাবু।

পাপ!

পাপ বৈকি।

কিন্তু তুমি তো আজ আর মানববাবুর স্ত্রী নও, তোমাদের তো ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে অনেক দিন আগে।

হ্যাঁ—আইনে তাই বলে বটে।

সেই আইনের আশ্রয় তো নিয়েছিলেন তোমার স্বামী—আর

নিশ্চয়ই সে কথাটা অস্বীকার করা যাবে না। আর সেদিন ছাড়পত্র স্বাক্ষরের মধ্যে তোমারও পূর্ণ সম্মতি ছিল।

না।

কি না?

ছিল না আমার সম্মতি—শুধু সেদিন আমি আমার স্বামীর সম্মতিটাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলাম।

তুমি কি আবার মানববাবুর কাছে ফিরে যেতে চাও অনুরাধা?

না।

যেতে চাও না?

না। কিন্তু ঐ নিয়ে আপনি আর আমাকে প্রশ্ন করবেন না।

সিঁড়িতে ঐ সময় আনন্দময়ীর গলা শোনা গেল। মৃদু গলায় শিবস্তোত্র আওড়াতে আওড়াতে আনন্দময়ী উপরে উঠে আসছেন।

হে বিশ্বনাথ, শিবশঙ্কর দেবাদিদেব
গঙ্গাধর প্রমথনাথ নন্দীকেশ
বাণেশ্বর লোকনাথ সংসারদুঃখদহনাৎ
জগদীশ রক্ষ

আনন্দময়ীর গায়ে একটা গরদের চাদর জড়ানো—হাতে কমণ্ডলু কক্ষমধ্যে এসে প্রবেশ করলেন। প্রদ্যুম্নের দিকে তাকিয়ে বললেন, ডাক্তারবাবু এসেছিলেন প্রদ্যুম্ন?

না পিসীমা।

কেমন আছো মেয়ে? আনন্দময়ী এবার বৈশালীকে প্রশ্ন করলেন।

ভাল মা। আজ আপনার ফিরতে যে এত দেরি হলো মা?

বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরে গেলে আর যেন বেরুতে ইচ্ছা করে না মেয়ে।

পিসীমা—

কিছু বলছিস প্রদ্যুম্ন?

হ্যাঁ পিসীমা, আমি যাচ্ছি—

যাচ্ছিস মানে। আনন্দময়ী প্রশ্নটা করে ভ্রাতুষ্পুত্রের মুখের দিকে তাকালেন।

এখুনি না বেরুলে পাঞ্জাব মেল ধরতে পারব না পিসীমা?

তা তুই যে আজই চলে যাবি তা তো কই সকালে বললি না।

না, বলি নি। পরে ভেবে দেখলাম আজই কলকাতায় ফেরা দরকার —অনেক কাজ রয়েছে।

আনন্দময়ী আর কিছু বললেন না। ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

প্রত্যুম্নও ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

ছোট সুটকেশটা গুছিয়ে নিয়ে পিসীমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বৈশালীর ঘরে এসে ঢুকল, চলি অনুরাধা।

সত্যিই এক্ষুনি যাচ্ছেন।

হ্যাঁ, অনুরাধা—যাবো যখন স্থির করেছি—যত তাড়াতাড়ি যেতে পারি ততই ভাল। চলি—কেমন!

হাতে সুটকেশটা ঝুলিয়ে নিয়ে প্রত্যুম্ন ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

রাত্রের দিকে যত কাজই থাক মানব আর সৌগন্ধ রাত্রে একত্রে টেবিলে বসে খেত। আর যত গল্প বাপ ও ছেলের ঐ সময়ই হতো।

কিন্তু এবারে কাশী থেকে ফিরে এসে সৌগন্ধ যেন কেমন চুপচাপ। টেবিলে এসে খেতে বসে কিন্তু বাপ ও ছেলের মধ্যে তেমন কথাই হয় না।

মানব কোন কথা বললে সৌগন্ধ হয় চুপচাপ শুনে যায়—না হয় দু-চারটে সংক্ষিপ্ত কথার জবাব দেয়।

মনে হয় সৌগন্ধ যেন কি ভাবছে।

দিন দশেক পরে সেদিনও রাত্রে বাপ ও ছেলে খেতে বসেছে টেবিলে —মানবই এক সময় প্রশ্ন করে, পড়াশুনা কেমন চলছে?

ভাল। সংক্ষিপ্ত জবাব সৌগন্ধর।

খোকন—

কিছু বলছো ড্যাডি?

তোমাকে আজকাল আর সকালে রেওয়াজ করতে শুনি না—তাছাড়া কোন প্রোগ্রাম তো কই আজকাল আর রেডিওতে শুনি না। প্রোগ্রাম কি দেয় না তোমাকে ?

না, আমিই নিজে থেকে দুটো প্রোগ্রাম ক্যানসেল করেছি—রেওয়াজও বন্ধ আছে।

বিস্মিত মানব শুধায়, ক্যানসেল করেছো !

হ্যাঁ।

কেন ?

পড়াশুনার ক্ষতি হয়।

না, না—কিছু ক্ষতি হবে না।

কিন্তু বাবা—

ঈশ্বর তোমাকে একটা বিশেষ গুণের অধিকারী করেছেন—সেটা—No my child, don't neglect it.

কিন্তু বাবা—একদিন তো ঐ গানের জন্যেই—

কি ! চমকে ওঠে মানব ছেলের কণ্ঠস্বরে যেন।

মায়ের সঙ্গে তোমার ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিল—তাই নয় কি ?

মানব একেবারে স্তব্ধ। ছেলের কথার কি জবাব দেবে বুঝতে পারে না, কোন জবাবই যেন ওষ্ঠপ্রান্তে তার যোগায় না।

এই প্রশ্নটা যে একদিন ছেলের দিক থেকে উঠতে পারে সেটা কি মানব আশঙ্কা করে নি ! তাছাড়া ছেলের গানের আসরে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর থেকেই ইদানীং বেশ কিছুদিন ধরে ঐ প্রশ্নটাই যে তার মনের মধ্যে আনাগোনা করতে শুরু করেছিল—একটা অজ্ঞাত ভয় তাকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলছিল।

আজ ছেলের প্রশ্নের জবাব তাকে দিতেই হবে। প্রশ্নোত্তরের প্রত্যাশায় ছেলে তার মুখের দিকে এই মুহূর্তে তাকিয়ে আছে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে মানব একটা কঠিন স্তব্ধতার মধ্যে মুখ তুলে তাকাল ছেলের দিকে। সৌগন্ধ তাকিয়েই আছে তার মুখের দিকে।

খোকন, তুমি সব ব্যাপারটা ঠিক জান না। তুমি তখন—কতই

বা তোমার বয়স—

কিন্তু ড্যাডি গানের জন্যই যদি শেষ পর্যন্ত তোমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়ে থাকে তো আমার গানের ব্যাপারে তুমি প্রশ্রয় দিলে কি করে! এমন তো নয় তুমি গান ভালবাস না তা নয়—বরং আমার তো মনে হয় তুমি গান-বাজনা ভালই বাসো ড্যাডি।

দেখ, তোমাকে আমি ঠিক বোঝাতে পারব না। গানের একটা ব্যাপার ছিল বটে তবে গানটা বোধহয় ছিল উপলক্ষ মাত্র। However that chapter is closed forever my child.

If I am not wrong ড্যাডি—তা তো নয়।

কি বলতে চাও তুমি?

তুমি আমার মামণিকে আজো ভুলতে পার নি—আর তিনিও হয়ত তোমাকে ভুলতে পারেন নি।

না, না—সে ভুলে গিয়েছে।

কি করে বুঝলে? তার সঙ্গে কি পরে কখনো তোমার দেখা হয়েছিল?

না।

চেষ্টা করেছিলে দেখা করতে?

আমি তো জানি না সে কোথায়। আজো বেঁচে আছে কিনা তাও জানি না।

আমি জানি—

কি জানো?

মামণি এখনো বেঁচেই আছেন।

কি—কি করে জানলে?

আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল।

কোথায়? কোথায় দেখা হলো তার সঙ্গে তোমার? কি করে বুঝলে যে সে-ই—

প্রথমটায় অবিশ্যি বুঝতে পারি নি। পরে বুঝতে পেরেছি। এবারে কাশীতে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

ঠিক বলছো তাকে তুমি চিনতে পেরেছো?

বললাম তো পেরেছি।

কেমন করে চিনলে এত বছর পরে—তখন তো তুমি সামান্য বালক ছিলে।

মাকে তো আমি আজো ভুলি নি।

সে তোমাকে চিনতে পেরেছিল?

হ্যাঁ—তিনিই তো আমার নাম ধরে আমাকে প্রথমে ডেকেছিলেন। ড্যাডি, আমি পরে অনেক খোঁজ করেছি তাঁকে দুদিন ধরে কাশীতে, কিন্তু কোন খোঁজ পাই নি তাঁর—আমি জানি, মা কাশীতেই আছেন।

কাশীতে কোথায়?

বললাম তো অনেক খোঁজ করেও সন্ধান পাই নি। ড্যাডি, আবার কি তুমি মাকে এ-বাড়িতে নিয়ে আসতে পার না?

তা কি করে সম্ভব হবে, আজ—

কেন সম্ভব হবে না?

তার হয় তো অন্য এক সংসার গড়ে উঠেছে—সে সংসার—

সংসার! অন্য এক সংসার!

হ্যাঁ। এত বছর হয়ে গেল—

সৌগন্ধ অতঃপর কি জবাব দেবে বুঝে উঠতে পারে না। কেমন যেন বিব্রত বোধ করে।

নয়

সৌগন্ধ ঐ দিকটা তো একবারও ভাবে নি!

খাবার টেবিল থেকে নিঃশব্দে উঠে এলো সৌগন্ধ তার ঘরে। মা—তার মা আবার নতুন করে সংসার পেতেছেন। তবে কি তার ধারণাটা মিথ্যা—সত্যিই তার মা তাদের একেবারে ভুলে গিয়েছেন, তাদের সঙ্গে সত্যি সত্যিই সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন!

সে যে কত আশা করেছিল যেখান থেকে যেমন করে হোক মাকে আবার সে খুঁজে নিয়ে আসবে।

বারান্দায় টেলিফোনটা বেজে উঠলো।

এত রাত্রে আবার কার ফোন এলো!

সৌগন্ধ তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বের হয়ে গিয়ে ফোনের রিসিভারটা তুলে নিল, হ্যালো—

সৌগন্ধ আছে? ওপাশ হতে প্রশ্ন ভেসে এলো।

গলার স্বরেই সৌগন্ধ চিনতে পারে—মেখলা।

এত রাত্রে কি ব্যাপার মেখলা?

মেখলা তারই সঙ্গে মেডিকেল কলেজে একই ইয়ারে পড়ে—তার সহপাঠিনী।

এত রাত্রে আবার কোথায়, মাত্র তো এগারটা।

এগারটা রাত বুঝি রাত নয়? সৌগন্ধ বললে।

না। ফিজিওলজী পড়তে পড়তে হঠাৎ তোমার কথা মনে হলো—কি ব্যাপার বল তো? তুমি কি হাসপাতালে আসছো না? ওয়ার্ড করছো না?

কয়েক দিন ওয়ার্ডে যাচ্ছি না—কাল যাবো।

শরীর খারাপ নাকি?

না।

অমন কাটা কাটা জবাব দিচ্ছ কেন। শোন—সারকুলেটারী সিসটেমটা আমাকে একবার পড়িয়ে দেবে। নিজে তো দিব্যি অনার্স মার্ক নিয়ে পাস করে গেলে—আর ফেল করে বসে রইলাম আমি ফিজিওলজীতে।

সৌগন্ধ মৃদু হাসে ফোনে।

হাসছো?

তা কি করবো বলো। শোন, কাল-পরশু এসো আমার এখানে, পড়িয়ে দেবো।

ঠিক বলছো?

হ্যাঁ—ফোন রাখি—

না—কত দিন পরে তোমার গলা শুনছি বল তো।

সামনের ঘরে বাবা রয়েছেন—ঘুম ভেঙে যাবে তাঁর।

ভাঙুক, আমি কাল গিয়ে কাকাবাবুর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবো। কিন্তু তোমার বাবাকে যা আমার ভয় করে না!

আমার বাবাকে তোমার ভয় করে?

ভীষণ! যা গম্ভীর মানুষ!

ভাল করে কথা বলে দেখো—আমার বাবাকে ভয় করার কিছু নেই। আচ্ছা চলি, গুড্ নাইট—

প্রত্যুত্তর এলো, গুড্ নাইট—সুইট ড্রিমস।

সৌগন্ধ ফোনটা রেখে দিল।

মেখলা বিশ্বাস—সৌগন্ধরই প্রায় সমবয়সী হবে। লেখাপড়ায় তো মেখলা বরাবরই খুব ভাল, তবু যে কেন এবার ফিজিওলজীতে ফেল করে গেল!

সত্যি কথা বলতে কি সৌগন্ধ ভাবতেও পারে নি মেখলা ফেল করতে পারে।

মেখলারা বেলেঘাটা অঞ্চলে কিছুদিন হলো উঠে গিয়েছে। তার বাবা নতুন বাড়ি করেছেন সেখানে। আগে তাদেরই পাড়ায় থাকত।

মেখলার বাবা সমর বিশ্বাস একজন নামকরা অ্যাটর্নী।

পরের দিন সকালে বাপ ও ছেলে আবার মুখোমুখি হলো ব্রেকফাস্ট টেবিলে।

মীনা আর সুরেন দুজনারই বয়স হয়েছে।

কিন্তু তা হলেও মানব নতুন কাউকে রাখে নি—ঐ পুরনো আয়া মীনা আর পুরনো চাকর সুরেনই সব দেখাশোনা করে।

মীনা যখন সৌগন্ধর তিন বৎসর বয়েস তখন এ-বাড়িতে এসেছিল আর সুরেন তারও আগে থেকে আছে।

পোরিজ শেষ করে দুজনে পোচ খাচ্ছিল। হঠাৎ মানব ছেলের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো, কাল অত রাতে কে ফোন করেছিল?

ছেলে একবার নিঃশব্দে বাপের মুখের দিকে তাকাল তারপর মৃদু-

কণ্ঠে বলল, মেখলা।

মেখলা—মানে তোমার সেই সহপাঠিনী ?

হুঁ।

মানব আর কিছু বললো না। টোস্টের প্লেটটা টেনে নিয়ে টোস্টে মাখন মাখাতে লাগলো।

খোকন—

কিছু বলছো ? ছেলে বাপের মুখের দিকে তাকাল।

আমি কয়েকদিনের জন্য বাইরে যাচ্ছি।

বেশ তো—তোমার শরীরটাও ইদানীং ভাল যাচ্ছে না—যাও না ছুটি নিয়ে ক'টা দিন ঘুরে এসো কোথায়ও।

তোমার অসুবিধা হবে না ?

না না, অসুবিধা কি। মীনাদি আছে—সুরেনদা আছে—

সত্যিই আমি কিছুদিন থেকে বড্ড tired বোধ করছি—

তা কোথায় যাবে কিছু ঠিক করেছো ড্যাডি ?

না।

দু-একদিন নয়—বেশ লম্বা একটা ছুটি নিয়ে ঘুরে এসো। ছুটি তো তুমি কখনো নাওই না।

মানব যে কতখানি একাকী অন্য কেউ না জানলেও সৌগন্ধ জানত। প্রথম প্রথম ব্যাপারটা বুঝতে পারে নি সৌগন্ধ। যত বড় হয়েছে বুঝতে শিখেছে—ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পেরেছে।

ডিভোর্স হয়ে যাবার পর আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবরা অনেকেই মানবকে আবার নতুন করে সংসার করতে বলেছে—কিন্তু কারো কথায় কান দেয় নি মানব। প্রত্যুত্তরে সে কেবল মৃদু মৃদু হেসেছে।

বাবার ছোটবেলার একান্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু মৃন্ময়কাকা অনেক বুঝিয়েছে মানবকে।

এখনো সারাটা জীবন তোর সামনে পড়ে মানব বলতে গেলে—এভাবে কাটাবি কি করে ?

না রে, তা হয় না। মানব বলেছে কেবল প্রত্যুত্তরে।

কেন তা হয় না ? মানবের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছে মৃন্ময়।

দূর, একজন পুরুষ একবারই জীবনে বিয়ে করতে পারে—আর উচিতও তাই।

Don't talk nonsense !

মৃন্ময়, তুই ঠিক বুঝবি না। মানব বলেছে।

কেন বুঝবো না। তাছাড়া ডিভোর্সই যখন হয়ে গিয়েছে—

ডিভোর্সটাই তো শেষ কথা নয় রে মৃন্ময়। তাছাড়া একটা কথা কি জানিস, স্ত্রী বলে আর কাউকে গ্রহণ করা এ-জীবনে আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

কথাগুলো আকস্মিকভাবেই সেদিন কানে এসেছিল সৌগন্ধর—বছর দশেক বয়েস তখন তার মাত্র। ডিভোর্সের বছর দুই পরের ঘটনা একদিনের—মৃন্ময় আর মানব দুই বন্ধুর মধ্যে এক সন্ধ্যায় কথা হচ্ছিল—পাশের ঘরে বসে সৌগন্ধ স্কুলের পড়া তৈরী করছিল—তার কানে এসেছিল কথাগুলো।

সত্যি কথা বলতে কি আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের ঐসব কথা প্রায়ই শুনে শুনে সৌগন্ধর মনের মধ্যে যেন একটা আশঙ্কার ছায়া ঘনীভূত হচ্ছিল। সত্যি কি বাবা আবার বিয়ে করবে! এ-গৃহে আর এক নতুন মা আসবে!

কথাটা কেন না জানি সৌগন্ধর আদৌ মনঃপূত হয় নি। আর এক মা আসবে এ সংসারে, কথাটা ভাবতেও যেন সৌগন্ধর ভাল লাগে নি।

মানবের মনের কথা বুঝতে পারে নি সৌগন্ধ। আর সেইখানেই ছিল সৌগন্ধর সংশয়। আর একজন মা আসবে তাদের সংসারে সৌগন্ধর কথাটা ভাবতেও যেন মন চায় নি,—কেন যে চায় নি সে ব্যাপারটা সৌগন্ধ নিজেও ভাল বুঝে উঠতে পারে নি। বাবার সঙ্গে এ-ব্যাপারটা নিয়ে একটা আলোচনা করবারও তার সাহস হয় নি।

হঠাৎ সেদিন মানবের কথাগুলো পাশের ঘর থেকে শুনে সৌগন্ধ যেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস নেয়। এবং মানবের প্রতি একটা শ্রদ্ধা সৌগন্ধ মনের মধ্যে অনুভব করে।

মানুষটাকে সৌগন্ধ চিরদিনই বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখে এসেছে। বোধ করি তার শান্ত ধীর স্বভাব, চারিত্রিক সংযম অল্প কথা বলাই ছিল তার মূলে।

সেই শ্রদ্ধার ভাবটাই সৌগন্ধর মনের মধ্যে আরো ঘনীভূত হয়েছিল বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে।

কেবল একটা জায়গায় তার দ্বন্দ্ব ছিল—

অমন যে মানুষটা সে তার স্ত্রীর সঙ্গে অমন করে বিচ্ছেদ ঘটালো কেন? এবং সে প্রশ্নের জবাব সৌগন্ধ কিছুতেই যেন খুঁজে পায় নি।

সৌগন্ধর মা ও বাবার যে একদিন ডিভোর্স হয়ে গিয়েছিল কথাটা সৌগন্ধ তার বন্ধুবান্ধবদের কখনো জানতে দেয় নি।

সবাই জেনেছিল, ছোটবেলাতেই সৌগন্ধর মা মারা গেছেন। তার বাবা আর দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন নি।

মার সম্পর্কে কোন আলোচনা কারো সঙ্গে করতও না কখনো। ব্যাপারটা সযতনে এড়িয়ে যেতো।

মাত্র একজন—একজন জানত সব কথা—তার প্রতিবেশিনী মেখলা।

দুটো বাড়ির পরই থাকতো মেখলারা—পরিচয়ের সূত্রে তাই উভয়ে উভয়ের বাড়িতে যাতায়াত করত।

মেখলার পক্ষে তাই সবই জানা সম্ভব ছিল।

মেখলা ব্যাপারটা জানলেও কিন্তু ঐ ব্যাপার নিয়ে সৌগন্ধর সঙ্গে কখনো কোন আলোচনা করত না। মেখলা জানত সৌগন্ধর মনের মধ্যে আজো তার মার সম্পর্কে একটা অত্যন্ত স্পষ্ট ছবি আছে এবং ডিভোর্সের সময় যে সে মার সঙ্গে যায় নি, বাপের কাছেই থেকে গিয়েছিল সেজন্য একটা ক্ষীণ অপরাধবোধ আছে তার মনের মধ্যে।

ঐ দিনই সৌগন্ধ যখন হাসপাতালের ওয়ার্ডে একটা রোগীর হিস্ট্রিশীট দেখছে গভীর মনোযোগের সঙ্গে—মেখলা এসে পাশে দাঁড়াল।

সৌগন্ধ—

কখন এলে ? সৌগন্ধ মুখ তুলে তাকাল মেখলার দিকে।

মেখলাকে আজ ভারী চমৎকার মানিয়েছিল হালকা বাসন্তী রঙের একটা শাড়ি পরে। এমনিতে মেখলা দেখতে খুব একটা সুন্দরী নয়।

তাহলেও তার পাতলা ছিপছিপে দেহের গঠন ও মুখের একটা আলগা লাবণ্যের জন্য, বিশেষ করে তার দুটি কালো টানা টানা চোখ ও একমাথা চুলের জন্য ভাল লাগত।

আর ঐ হালকা বাসন্তী রঙটা ছিল বরাবর সৌগন্ধর অত্যন্ত প্রিয় রঙ।

মেখলাও সেটা জানত।

মেখলা বলল, খুব ব্যস্ত নাকি ?

না, কি ব্যাপার—

চল রেস্টুরেন্টে—

তবে একটু দাঁড়াও, হিস্ট্রিশীটটায় আমার ফাইনডিংসগুলো লিখে নিই—কাল ডাঃ সিনহা বলে গেছেন।

কত দেরি হবে ? মেখলা শুধালো।

বেশী নয়—মিনিট পনের।

তবে আমি রেস্টুরেন্টে যাচ্ছি, তুমি এসো। মেখলা চলে গেল।

মিনিট পঁচিশেক পরে সৌগন্ধ রেস্টুরেন্টে এসে দেখে মেখলা এক কোণে একটা চেয়ারে এক কাপ চা সামনে নিয়ে চুপচাপ বসে আছে।

সৌগন্ধ একটা চেয়ার টেনে নিয়ে মুখোমুখি বসল।

চা খাবে ? মেখলা বললে।

বলে এসেছি—তুমি দেখছি চায়ের কাপে বোধহয় এখনো চুমুকই দাও নি।

মেখলা চায়ের কাপটা টেনে নিতে যাচ্ছিল, সৌগন্ধ বাধা দিল। যাক, ওটা বোধহয় ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে, আমি দু' কাপ চায়ের কথাই বলে এসেছি।

সত্যিই তাই—ঐ সময় ছোকরা একজন দু' কাপ চা টেবিলের উপরে নামিয়ে রেখে গেল।

কিছুক্ষণ অতঃপর নিঃশব্দে পরস্পর পরস্পরের কাপে কয়েকবার চুমুক দেয়। বেলা তখন প্রায় পৌনে বারটা—রেস্টুরেন্টে ছাত্রছাত্রী খুব বেশী একটা ছিল না।

ঐ সময়টায় রেস্টুরেন্টে ভিড়ও বেশী একটা থাকে না। ছেলে-মেয়েদের ক্লাস থাকে, প্র্যাকটিক্যাল থাকে, বেড সাইড্ ক্লিনিক থাকে।

এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে দু-চারজন ছাত্রছাত্রী চা পান করছিল।

সৌগন্ধ—

উঁ—

কাশী থেকে কবে ফিরলে? মেখলা প্রশ্ন করে।

দিন পাঁচেক হলো। সৌগন্ধ জবাব দেয়।

খুব এনজয় করেছো?

মন্দ লাগলো না।

একজনের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল—হঠাৎ বললে মেখলা, কই সে কথা তো কাল রাত্রে আমাকে বললে না?

দেখা হয়েছিল?

হ্যাঁ।

কার সঙ্গে?

কেন—তোমার মার সঙ্গে।

চমকে ওঠে সৌগন্ধ। বললে, কে বললে তোমায়?

রামানুজ বলছিল কাল।

রামানুজ বলেছে?

হ্যাঁ। কথাটা কিন্তু রামানুজ বলবার আগে তোমার মুখ থেকেই শোনবার আশা আমি করেছিলাম।

সৌগন্ধ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর শান্ত গলায় বললো, ব্যাপারটা এমনি আকস্মিক মেখলা যে এখনো যেন—

কি?

আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।

তোমার কি কোন সন্দেহ আছে ?

কিসে ?

যে তিনি তোমার মা নন ?

না।

তিনি তোমার মা-ই।

হ্যাঁ। ভুল আমার হয় নি।

রামানুজের মুখ থেকে যদিও ব্যাপারটা সব আমি শুনেছি তবু তোমার মুখ থেকে আমি শুনতে চাই। সব কথা বল আমাকে—কি ঘটেছিল—

সৌগন্ধ আনুপূর্বিক ঘটনাটা বলে গেল। তারপর বললে, কি তোমার মনে হয় মেখলা—মাকে চিনতে কি ভুল করেছি ?

না। তুমি ঠিকই চিনেছো।

আমি সত্যিই নিশ্চিন্ত হলাম মেখলা আজ।

ওকথা বলছো কেন ? মেখলা বললে।

মনের দিক থেকে একান্ত ভাবে নিশ্চিন্ত হওয়া সত্ত্বেও মনের মধ্যে কোথায় যেন আমার ছোট্ট একটা কিন্তু ছিল, কিন্তু এখন তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে—নিঃসন্দেহে আমি ভুল করি নি। জান মেখলা—

কি ?

গতরাত্রে ডিনার টেবিলে বসে ড্যাডিকে আমি সব বলেছি—

বলেছো ?

হ্যাঁ।

খুব ভাল করেছো। মেখলা বললে।

দশ

কিছুক্ষণ তারপর উভয়ের মধ্যে একটা স্তব্ধতা।

দুজনেরই চায়ের পেয়ালা ইতিমধ্যে নিঃশেষিত হয়েছিল, গোটা দুই

মাছি সেই শূন্য পেয়ালা দুটোর উপরে ঘুরপাক খাচ্ছিল আর বসছিল।

সেই দিকে তাকাতে তাকাতেই সৌগন্ধ পকেট থেকে সিগারেট প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট নিয়ে অগ্নিসংযোগ করল।

আচ্ছা মেখলা—

বল।

মাকে কি আবার ফিরিয়ে আনা যায় না?

আমার কি মনে হয় জান সৌগন্ধ—

কি?

তোমার মা আজও বোধহয় সেই অপেক্ষাতেই বসে আছেন।

কিন্তু যদি এমন হয়ে থাকে—

কি? মেখলা সৌগন্ধর মুখের দিকে তাকাল।

মা যদি আবার—

কি? থামলে কেন বল?

মা নতুন করে আবার—

বলা শক্ত—তবে—

তবে কি?

মনে হয়—তা হয়ত তিনি করেন নি।

দীর্ঘ পনেরটা বছর তো কম সময় নয় মেখলা।

একটা সময়ের মাপকাঠিতে কোন কি সব সময় একটা মানুষকে বিচার করা যায় সৌগন্ধ! তা বোধহয় যায় না।

যায় না বলছো?

দীর্ঘ দশ বৎসর প্রায় একজনের সঙ্গে ঘর করে সেই ঘরকে, সেই ঘরের মানুষজনকে একেবারে ভুলে যাওয়াটা বোধহয় সম্ভব নয় সৌগন্ধ। তোমার বাবার দিকেই চেয়ে দেখো না—তিনিই কি তা পেরেছেন?

না।

তবেই ভেবে দেখো একজন পুরুষ হয়ে তাঁর পক্ষে যা সম্ভব হয় নি, একজন নারীর পক্ষে কি তা অত সহজে সম্ভব হয়, না হতে পারে! কি জান সৌগন্ধ—যতই আমাদের সভ্যতার অগ্রগতি ও দৃষ্টিভঙ্গি নতুন

নতুন আইনের প্রবর্তন করুক না কেন, আমাদের এতদিনকার সংস্কার, এত কালের নৈতিক বোধ তাকে কি একেবারে মুছে ফেলা যায়! সেদিক দিয়ে বিচার করলে হয়ত আশঙ্কাটা অমূলক। কথাটা তা নয় সৌগন্ধ—

তবে কি?

তোমার বাবার মন সত্যিকারের কি চায়, তিনি কি খোলা মন নিয়ে আবার তোমার মাকে গ্রহণ করতে পারবেন আজ?

না, না—দেখো ড্যাডি ঠিক পারবে। ড্যাডি যে আজো মাকে ভুলতে পারে নি তাও তুমি জান মেখলা।

জানি— তবে না ভোলা আর গ্রহণ করার মধ্যে একটা কিন্তু আছে।

সৌগন্ধ আর কোন কথা বলে না।

সে চুপ করে যায়।

মেখলা সৌগন্ধকে কথাটা সেদিন মিথ্যে বলে নি।

মানবের মনের মধ্যে সত্যিই একটা কিন্তু যেন সর্বক্ষণ তাকে পীড়ন করছিল—বৈশালীর প্রসঙ্গ নতুন করে আবার দীর্ঘ পনের বছর পরে তার মনের মধ্যে এসে স্থান পাওয়ায়।

মাস দুয়েকের ছুটি নিয়ে মানব এক রাত্রে বের হয়ে পড়েছিল। ভিতরে ভিতরে একটা অস্থিরতাই যেন তাকে ঘরের বাইরে টেনে নিয়ে এসেছিল। দিল্লী-মথুরা-বৃন্দাবন ঘুরে অবশেষে মানব এলো হরিদ্বারে। মন তার তীর্থেও ছিল না, দেশভ্রমণেও ছিল না।

তার মনের সবটা জুড়ে ছিল কেবল বৈশালী। তার স্ত্রী বৈশালী—দীর্ঘ পনের বছর আগে যার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছে আইনের স্বেচ্ছাকৃত যূপকাষ্ঠে।

মানব ঘুরে ঘুরে বেড়াত আর তার দুটি চক্ষু পনের বৎসর আগেকার আদালতের কক্ষে শেষবারের মত দেখা একটি পরিচিত মুখের সন্ধান করতো নিজের অজ্ঞাতেই বুঝি।

কিন্তু আকাঙ্ক্ষিত সে মুখটির দর্শন সে পায় না। আর বারবার গত

পনের বৎসরের হিসাবনিকাশের খতিয়ান করে।

হঠাৎ কেন সেদিন তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো।

বৈশালীর চালচলনে এমন কিছুই তো সে দেখতে পায় নি সেদিন যাতে করে তার মনে সন্দেহ জাগতে পারে। নতুন করে যেন আবার পনের বছর পরে মানব নিজেকে নিজে বিশ্লেষণ করে দেখতে চায়।

বৈশালীর যে গান একদিন তার প্রতি তাকে আকৃষ্ট করেছিল সেই গানই শেষটায় তার মনটাকে বৈশালীর প্রতি অমন করে বিষিয়ে তুলল কেন একটু একটু করে।

তবে কি সেটা ছিল তার নিছক হিংসা।

বৈশালীর ক্রমবর্ধমান যশ-প্রতিপত্তি, তার ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠাই কি সেদিন তাকে ঈর্ষান্বিত করে তুলেছিল ক্রমশঃ। না, না—তা হবে কেন। তা নয়। মনকে বুঝাবার বুঝি চেষ্টা করে মানব। আবার কখনো মানবের মনে হয়, তবে কি তার মনে হয়েছিল বৈশালী পল্লব সেনের প্রতি আকৃষ্ট? বিবাহের অনেক আগে থেকেই তো পল্লব সেনের সঙ্গে বৈশালীর পরিচয় ছিল। সঙ্গীত জগতে প্রতিষ্ঠিত সুকণ্ঠ গায়ক পল্লব সেনের সঙ্গে তো অনেক দিন ধরেই একটা ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল বৈশালীর। কথাটা তো মানবের অজ্ঞাত ছিল না। মানব তো জানত বৈশালী পল্লব সেনের গৃহে যায়, পল্লব সেনও মধ্যে মধ্যে তার গৃহে আসে।

কত জায়গায় কত বার দুজনে একসঙ্গে গান করতে গিয়েছে। একত্রে দুজনের ছবি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। কখনো তো ঐ প্রশ্নটি তার মনে জাগে নি।

আজ সে তো অস্বীকার করতে পারে না। বৈশালীকে ঘিরে তার মনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব জেগে ছিল এবং সেই দ্বন্দ্বটাই ক্রমশঃ ধূমায়িত হতে হতে তার সমস্ত মনটাকে গ্রাস করেছিল একটা বিষাক্ত জ্বালার কালো মেঘে।

তার দম বন্ধ হয়ে আসছিল।

আর সেই অবস্থাতেই সে ক্রমশঃ একটু একটু করে বৈশালীর কাছ

থেকে দূরে সরে আসছিল। উভয়ের মধ্যে একটা ব্যবধান ক্রমশঃ রচিত হতে থাকে। যে ব্যবধানটাই শেষ পর্যন্ত দুজনকে দুজনের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

অবশেষে একদিন দুজনা দুজনের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, দুজনা দুজনের নাগালের বাইরে চলে গেল।

হরিদ্বারেও মন বসল না মানবের।

বসবে কি করে, মানবের সমস্ত মনটাই যে পড়েছিল কাশীর গঙ্গার ঘাটে।

যে দিন সে ডিনার টেবিলে বসে ছেলের মুখ থেকে শুনেছে সৌগন্ধ তার মায়ের দেখা পেয়েছিল কাশীর গঙ্গার ঘাটে, সেদিন থেকেই তার সমস্ত মনটা যে তার নিজের অজ্ঞাতেই সেই দশাশ্বমেধ ঘাটের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এবং সেই দশাশ্বমেধের ঘাটই তাকে যে ঘরের বাইরে টেনে এনেছিল।

এখানে ওখানে অনির্দিষ্ট ভাবে ঘুরে সে শান্তি পাবে কেন। মানব তাই একদিন রাত্রের গাড়িতে কাশীর উদ্দেশ্যে চেপে বসল।

শীত তখন বেশ পড়তে শুরু করেছে।

খোলা জানলাপথে চলমান গাড়ির শীতের হাওয়া এসে কামরার মধ্যে প্রবেশ করতে থাকে। কুপের মধ্যে সে একাই ছিল—অন্য কোন দ্বিতীয় যাত্রী ছিল না।

জানলাটা বন্ধ করলো না মানব।

সুটকেশ থেকে শালটা বের করে সেটা গায়ে জড়িয়ে নিল।

কাশীতে সে বৈশালীর দেখা পাবে তো!

যদি না পায়—কাশীতে যদি না থাকে বৈশালী!

তাহলে কাশী থেকে সে কোথায় যাবে।

আর কাশীতে যদি দেখা হয়ে যায় আবার বৈশালীর সঙ্গে তার—কি বলবে সে!

বলতে পারবে তো মানব, চল বৈশালী, তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি!

বৈশালী যদি বলে, কোথায় ?

কেন আমাদের ঘরে।

কেন ? বৈশালী যদি প্রশ্ন করে।

বৈশালী কি অস্বীকার করবে যেতে !

পরের দিন বৈকালের দিকে ট্রেনটা এসে ইন করলো বারাণসী স্টেশনে।

একটি মাত্র মাঝারি আকারের সুটকেস নিয়ে মানব বাড়ি থেকে বের হয়েছিল। সেই সুটকেসটাই একটা কুলির মাথায় চাপিয়ে সিঁড়ি পার হয়ে স্টেশনের বাইরে এসে দাঁড়াল মানব।

অনেক বছর আগে একবার কাশীতে এসেছিল। অনেক অদল-বদল হয়ে গিয়েছে স্টেশনটার, হরিদ্বার থেকেই খোঁজ নিয়ে জেনেছিল মানব গোধুলিয়াতেই একটা চমৎকার নতুন হোটেল হয়েছে—সেই হোটেলের ঠিকানাতেই একটা 'কেবল্' পাঠিয়ে দিয়েছিল।

একটা ট্যাক্সি নিয়ে মানব সোজা এলো গোধুলিয়াতেই সেই হোটেলটায়। হোটেলের ঘরটা মন্দ নয়—একেবারে রাস্তার উপরে দোতলায়।

কাশী এই কয় বৎসরে অনেক বদলে গিয়েছে।

এক্কা তো দেখাই যায় না—টাঙ্গাও বড় একটা চোখে পড়ে না। কেবল অসংখ্য সাইকেল রিকশার ক্রিং ক্রিং অবিশ্রাম ঘন্টির শব্দে যেন কান ঝালাপালা হবার যোগাড়। তার মধ্যে আবার প্রাইভেট গাড়ি ও বাস—অগণিত মানুষ পথে—নানা বয়েসী।

মনে হয় কাশীর জনসংখ্যা যেন দশ বিশ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

মানুষ—মানুষ আর মানুষ।

কিন্তু মনটা পড়েছিল মানবের দশাশ্বমেধ ঘাটের চারপাশে। রোদ পড়ে যাবার পরই মানব শালটা গায়ে চাপিয়ে গঙ্গার ঘাটের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ল।

দশাশ্বমেধ ঘাটও সেই পরিচিত ঘাট আর নেই।

অজস্র পুণ্যার্থী ও বায়ুসেবীর ভিড়।

একটু নির্জন স্থান খুঁজে নিয়ে গঙ্গার জল খেয়ে একটা সিঁড়ির উপরে উপবেশন করল মানব।

ওপারের আলো ধূসর ম্লান হয়ে আসছে দিনশেষের ছোঁয়ায়। গঙ্গার জল নীলাভ, ধূসর পর্দা একটা নামছে যেন গঙ্গার বক্ষে।

দূরে মণিকর্ণিকার ঘাটে বোধহয় গোটা দুই চিতা জ্বলছে—তার রক্তাভ শিখা উর্ধ্বমুখী।

বৈশালী এখনো তেমন সুস্থ হয়নি। শরীরের মধ্যে যেন একটা কেমন ক্লান্তি, অবসন্নতা সর্বক্ষণই বৈশালী অনুভব করে।

শিক্ষায়তনের থেকে মাস দুয়েকের ছুটি নিয়েছিল বৈশালী। বেশীর ভাগ সময়ই দোতলায় নিজের ঘরটিতে চুপচাপ বসে থাকত বৈশালী।

আগে আগে সময় পেলেই সন্ধ্যার দিকে সে গঙ্গার ঘাটে যেত—আজকাল আর কোথায়ও বেরুতেই যেন ভাল লাগে না। ঐ ঘরটার মধ্যেই তার সময় কাটে।

আনন্দময়ী প্রথম প্রথম কেবল লক্ষ্য করেছেন নিঃশব্দে বৈশালীকে। কিছু বলেননি এবং বৈশালী যখন শিক্ষায়তন থেকে ছুটি নিল তখনও কিছু বলেননি।

আনন্দময়ী মেয়েটার মনের দ্বন্দ্ব বুঝতে পারছিলেন।

আনন্দময়ী অনেকদিন আগেই বুঝতে পেরেছিলেন—ডিভোর্স হয়ে গেলেও আজও বৈশালী তার স্বামীকে ভুলতে পারেনি। তার মন এখনো তার সন্তানের জন্য কাঁদে।

অসহায়, নিরুপায় মেয়েটা মনের মধ্যে দিবারাত্র ছটফট করছে একটা যন্ত্রণায়। শিক্ষায়তনের কাজটুকু নিয়ে সে কেবল নিজেকে ভোলাবার চেষ্টা করে।

কিন্তু হঠাৎ এত বছর পরে তার ছেলে তার সামনে এসে দাঁড়াতে বৈশালী যে রীতিমত বিচলিত হয়ে পড়েছে সেটাও আনন্দময়ী বুঝতে পারছিলেন। কিন্তু তিনি নিজেও কোন পথই খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

আকস্মিকভাবে যে বৈশালী অসুস্থ হয়ে পড়েছিল এবং তারও মূলে যে ছিল এতকাল পরে পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ, সেটাও বুঝতে পারছিলেন আনন্দময়ী। মেয়েটার জন্য মনে মনে একটা ব্যথা অনুভব করেন আনন্দময়ী।

কিন্তু এও আনন্দময়ী বুঝতে পারেন না—কি তিনি করবেন, কিই বা তিনি করতে পারেন?

আর সব চাইতে বড় কথা মেয়েটা গান গাওয়া একেবারে যেন বন্ধ করে দিয়েছে।

প্রত্যহ সন্ধ্যার আগে বেরুতেন আনন্দময়ী—গঙ্গার ঘাটে কিছুক্ষণ থেকে চলে যেতেন বিশ্বনাথের মন্দিরে। ফিরতেন সেই রাত্রে সন্ধ্যা-রতির পর, কোন কোন রাত্রে একেবারে শয়নারতির পর। সেদিন বের হলেন না আনন্দময়ী।

এসে ঢুকলেন সন্ধ্যার পর বৈশালীর ঘরের মধ্যে।

অন্ধকার ঘরে চুপচাপ বসেছিল বৈশালী।

অন্ধকারে বসে আছো মেয়ে, আলো জ্বালাওনি? আনন্দময়ী বললেন।

অন্ধকারই ভাল লাগে মা। আপনি আজ বের হননি?

না গো মেয়ে—

শরীর খারাপ হয়নি তো মা? শুধায় বৈশালী।

না, না—শরীর ভালই আছে—তা তোমার ছুটিও তো শেষ হয়ে এলো।

ভাবছি—চাকরি আর করবো না মা।

সে কি মেয়ে—চাকরি করবে না কেন?

আর ভাল লাগছে না।

একটা কথা বলবো মেয়ে?

কি কথা মা?

তোমার কলকাতার বাড়ির ঠিকানাটা আমায় দেবে?

সে ঠিকানা নিয়ে আপনি কি করবেন?

ছেলেকে একটা চিঠি লিখবো। ভুল বোঝাবুঝি যদি একটা হয়েই থাকে দুজনের মধ্যে সেটাকেই চিরদিনের মত আঁকড়ে থেকে লাভ কি ?

সে যদি তা মনে করত তবে কি এই পনের বছরেও তার দিক থেকে কোন সাড়া আসত না ?

সাড়া সে দিয়েছিল কি না তুমি জানলে কি করে মেয়ে ?

দশ বছর একসঙ্গে ঘর করেছি মা—মানুষটাকে কি চিনতে আমি পারিনি আজো আপনি বলতে চান ?

সব সময়ই কি খুব কাছাকাছি এবং ঘনিষ্ঠভাবে থেকেও একজন অন্যজনকে চিনতে পারে মেয়ে—আনন্দময়ী বলতে লাগলেন একটু থেমে, না মেয়ে, চিনতে বোধহয় পারে না। কোন কোন সময় সারাটা জীবন কেটে যায় একজনের অন্যজনকে চিনতে। দেখো মেয়ে, কোন কিছু ভেঙে ফেলা যত সহজ, গড়ে তোলা তত সহজ নয়।

কিন্তু মা. তোমাকে তো সবই বলেছি—আমার অপরাধটা কোথায় ?

সেও হয়ত ভাবছে মেয়ে তারই বা অপরাধটা কোথায়। কি একটা হঠাৎ ঘটে গেল, তোমরা দুজনই দুজনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে —দশ বছরের বিবাহিত জীবনের কথাও ভাবলে না—একটা সন্তান আছে তাব কথাও ভাবলে না। দেখো মেয়ে, হিন্দু সমাজে, হিন্দু সংস্কারে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা এত সহজে নাকচ করে দেওয়া যায় না যতই তোমরা কেতাব পড় আর যতই আইন পাস কর। আজো যে মানুষটাকে ভুলতে পারনি মেয়ে তাও কি তুমি অস্বীকার করতে পারো ? আমি বলি কি হয় আমাকে তুমি একটা চিঠি লিখতে দাও না-হয় তুমিই তাকে একটা চিঠি লেখো।

না মা, তা আজ আর সম্ভব নয়।

সম্ভব নয় ?

না।

কেন ?

পনের বছরের ছেঁড়া সুতো যতই গিঁট দাও না কেন আর কি জোড়া

লাগে ? না মা, আর কোন দিনই জোড়া লাগবে না।

তাই যদি জানো মেয়ে তো প্রত্যুম্নকে ফিরিয়ে দিলে কেন ?

মা—একটা অর্ধস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে যেন বৈশালী।

এভাবে থাকতে থাকতে যে শেষ পর্যন্ত তুমি পাগল হয়ে যাবে মেয়ে।

না মা, পাগল হবো না। পনেরটা বছর যখন কেটে গিয়েছে, বাকী জীবনটাও কেটে যাবে।

আনন্দময়ী আর কিছু বললেন না, ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

এগার

বৈশালী ভাবে, সত্যিই তো, কেন সে এমনি করে ঘরের মধ্যে নিজেকে বন্দিনী করে রেখেছে ! সত্যিই তো এ জীবনে আর কোনদিনও সেই সংসারে ফিরে যেতে পারবে না ! এই পনের বছর ব্যবধানটা যে দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হয়েছে !

বৈশালী আবার উঠে দাঁড়াল।

আবার সংগীত প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত শুরু করে দিল।

আবার সময় পেলে বিকেলে গঙ্গার ঘাটে যায়।

সেদিনও গিয়েছিল গঙ্গার ঘাটে। বিকেলের দিকে দশাশ্বমেধ ঘাটের পশ্চিম দিকে একটা সিঁড়ির উপর বসে ছিল গঙ্গার দিকে তাকিয়ে। সন্ধ্যা নামে ধীরে ধীরে ম্লান পাখা মেলে। গঙ্গার জল ঝাপসা হয়ে যায়।

সন্ধ্যারতির কাঁসর ঘণ্টা বেজে ওঠে।

চমক ভাঙে যেন বৈশালীর।

উঠে পড়ে বৈশালী। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে থাকে। বৈশালী দেখতে পায়নি মানব ঐ শেষ সিঁড়ির বাঁধানো জায়গাটায় বসে ছিল।

মানব দেখতে পায় বৈশালীকে। সে চমকে ওঠে। বৈশালী না—হ্যাঁ, বৈশালীই তো। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে মানব, বৈশালীকে অনুসরণ

করে পায়ে পায়ে। বৈশালী অন্যমনস্ক হয়ে পথ চলেছে—এদিক ওদিক একবারও তাকায় না।

বৈশালী—বৈশালী—

ডাকতে গিয়েও ডাকতে পারে না মানব, গলা থেকে স্বর বের হয় না।

দোকানের উজ্জ্বল আলোর খানিকটা বৈশালীর চোখে মুখে এসে পড়েছে। পনের বছর পরে—তবু চিনতে কষ্ট হয় না মানবের।

ঠিকই সে চিনেছে বৈশালীকে।

এত রোগা হয়ে গিয়েছে বৈশালী! রগের দু'পাশের চুলে পাক ধরেছে—পাকা চুল চিক্‌চিক্ করছে।

বৈশালী রাস্তা ছেড়ে একটা গলিতে প্রবেশ করল।

মানব বৈশালীর পিছনে পিছনে চলে। এ গলি থেকে অন্য গলি—অন্ধকার সব গলি—তার মধ্যে দিয়েই লোকজন চলাচল করছে, মধ্যে মধ্যে দোকান মিঠাইয়ের, দুধ রাবড়ি দইয়ের বেচাকেনা চলেছে। বৈশালীর যেন কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সে যেন কি এক আচ্ছন্নের মধ্যে হেঁটে চলেছে। মাথায় ঘোমটা, গায়ে শাল।

সারাটা পথ অনুসরণ করে বৈশালীর গৃহের দরজা থেকে মানব ফিরে এলো নিঃশব্দে হোটেলে। বৈশালীকে ডাকতে পারল না। গলা দিয়ে কোন স্বরই বেরুল না।

হোটেলে নিজের ঘরে ফিরে এসে কেবল একটা প্রশ্নই বারবার তার সামনে এসে দাঁড়াতে লাগল, কি বলবে সে বৈশালীকে। কি বলতে সে এসেছে। কি বলতে চায় সে। সব কিছুরই তো সে শেষ করে দিয়েছিল সেই পনের বছর আগে।

কেন, সে কি বলতে পারে না, পনের বছর আগে যা সেদিন বলবার ছিল। বলতে পারতে অথচ কিছু বলোনি অন্ততঃ সেই কথাটাই বলো।

যদি বলে বৈশালী, আজ তাতে আর কার কি লাভ হবে। যা অনেকদিন চুকে-বুকে গিয়েছে সে কথা আজ আবার কেন। আজ আর

আমারও কিছু বলবার নেই। তোমারও কিছু শোনবার নেই। তার চাইতে সে চেষ্টা বোধ হয় আর না করাই ভাল।

মানব মনে মনে স্থির করে সে কালই কলকাতায় ফিরে যাবে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটিবার বৈশালীর সঙ্গে কথা বলবার লোভ সামলাতে পারে না বুঝি মানব। তাই পরের দিন দুপুরের দিকে বৈশালীর বাড়ির সামনে গিয়ে হাজির হয়।

বৈশালী একাই গৃহে ছিল।

আনন্দময়ী এখনো মন্দির থেকে ফেরেননি।

কিছুটা দ্বিধা, কিছুটা সংকোচের মধ্যেই এক সময় মানব বাড়ির দরজার কড়া ধরে নাড়া দিল। বৈশালী নিজের ঘরে বসে একটা বই পড়ছিল। বেলা দুটো বাজে, আনন্দময়ী এখনো মন্দির থেকে ফেরেন-নি। ঠিকা ঝির আসার সময় হয়নি—এ সময় আবার কে এলো—বৈশালী দরজা খোলার জন্য নীচে নেমে আসে।

দরজাটা খুলেই কিন্তু বৈশালী থমকে দাঁড়াল সামনের মানুষটাকে দেখে।

পনের বছর পরে হলেও মানবকে চিনতে তার কষ্ট হয়নি আর না হবারই কথা। চেহারা বিশেষ বদলায়নি মানবের। তা বদলালেও কি বৈশালীর চিনতে কষ্ট হতো যার সঙ্গে এক সময় দশটা বছর ঘর করেছে। আর একটু কৃশ হয়েছে এই যা মানুষটা। এ তো সেই পনের বছর আগেকারই মানুষটি।

কপালের দু'পাশের চুলে পাক ধরেছে—মধ্যস্থানে সামান্য টাক দেখা দিয়েছে। তবে স্যুট-প্যান্ট নয়, পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি, চোখে সেই কালো সেলুলয়েডের ফ্রেমের চশমা পুরু লেন্সের, সেই খাড়া নাক, ছোট কপাল, কয়েকটা স্তব্ধ মুহূর্ত।

কথা বললে প্রথমে মানবই, চিনতে পারছো না?

মানব কথাগুলো বললো বটে কিন্তু তার দৃষ্টি ছিল বৈশালীর সিঁথি ও কপালের উপরে। সেখানে জ্বলজ্বল করছে এয়োতির চিহ্ন সিঁদুর। মনে যে প্রশ্নটা জাগে এই মুহূর্তে, বৈশালী কি আবার বিবাহ করেছে!

ভিতরে আসতে পারি ? আবার বললে মানব মনের প্রশ্নটাকে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে।

নিঃশব্দে বৈশালী দরজার সামনে থেকে একটু সরে দাঁড়াল। মানব বৈশালীর পাশ কাটিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল।

বৈশালী নিঃশব্দে অতঃপর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে থাকে। মানব তাকে অনুসরণ করে, যেন মানব নিত্যকারের মত বাড়ি এসেছে—বৈশালী তাকে দরজাটা খুলে দিয়েছে।

ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করল বৈশালী এবং এতক্ষণে কথা বললো, এসো।

মানব ঘরের চার পাশে আবার অনুসন্ধানী দৃষ্টিটা তার বুলিয়ে নিল। ঘরের কোণে একটা চেয়ার ছিল, সেটাই নির্দেশ করে বৈশালী বললে, বোস।

মানব কিন্তু বসলো না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই প্রশ্ন করলো, এখানেই তুমি থাক ?

হ্যাঁ।

বরাবর এখানেই আছো ?

বৈশালী মানবের ঐ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললে, কাশীতে কবে এলে ?

নানা জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে আজ দিন সাতেক হলো কাশীতে এসেছি।

বেড়াতে বের হয়েছো ?

না, ঠিক তা নয়।

তবে ? তীর্থ করতে ?

তীর্থ ! মৃদু হাসলো মানব, না—ঐ তীর্থ-টীর্থের উপরে যে কোন দিন আমার কোন লোভ নেই তা তো তুমি জান।

একাই এসেছো ?

হ্যাঁ—একাই।

দুজনে বেশ সহজ ভাবেই কথাবার্তা বলতে থাকে। পরিচিত

দুজনের যেন অনেক দিন পরে দেখা হয়েছে—কারো কথার মধ্যেই কোন জড়তা বা অস্পষ্টতা নেই। সংকোচ বা কোন রকম দ্বিধা নেই।

একা কেন? স্ত্রীকে আননি সঙ্গে?

স্ত্রী!

হ্যাঁ—তীর্থস্থানে এলে তো স্ত্রীকে সঙ্গে করেই আসতে হয়। মৃদু হাসলো বৈশালী।

না।

কি না?

সে সৌভাগ্য আর হলো কোথায়। কিন্তু তোমাকেও তো একাই দেখছি, এ-বাড়িতে তুমি একাই থাক নাকি? আর কেউ থাকে না এ-বাড়িতে। মানবের মনের মধ্যে আবার সেই প্রশ্নটাই উঁকি দেয়।

মা আনন্দময়ী থাকেন। বৈশালী বললে।

মা আনন্দময়ী!

হ্যাঁ, যাঁর বাড়ি এটা।

আর কেউ থাকে না?

আর কে থাকবে?

কেন তোমার স্বামী?

এবারে বৈশালী একটু গম্ভীর হয়ে বললে, আপাততঃ আমি একাই আছি। এবারে বল তো এত বছর পরে হঠাৎ কি মনে করে এখানে এলে, আর আমার এখানকার ঠিকানাই বা পেলে কি করে? কার কাছ থেকে পেলে?

তুমি যে বাড়ি কেনার বাকী টাকাগুলো সোসাইটিতে জমা দিয়েছিলে সেই টাকাটা শোধ দেবার জন্য।

পরিশোধ নেবো বলে একদিন তো টাকাটা আমি দিইনি সেদিন।

কিন্তু আমিই বা তোমার সে টাকা নেবো কেন?

তোমাকে তো আমি দিইনি, দিয়েছিলাম তো আমি আমার ছেলেকে।

আর ছেলে যদি সে টাকাটা না গ্রহণ করে?

কি—কি বললে?

হ্যাঁ, সে যদি ফিরিয়ে দিতে চায় তোমার ঐ টাকা ?

খোকন ! খোকন ঐ কথা বলেছে ?

বলাটাই কি স্বাভাবিক নয় ?

বৈশালী চুপ করে থাকে। সে যেন হঠাৎ পাথর হয়ে গিয়েছে।

তোমার সঙ্গে তাব দেখা হয়েছিল। মানব তারপর বললে।

বলেছে—খোকন সে কথা বলেছে তোমাকে বুঝি ? তাকে তো আমার পবিচয় দিইনি—সে আমায় চিনবে কি করে ?

বোধহয় চিনতে তোমাকে তার কষ্ট হয়নি।

কি—কি বলেছে সে ? আমাকে সে চিনতে পেরেছে সত্যিই ?

পালটা প্রশ্ন করি, তোমার কি মনে হয় ? কথাটা বলে মানব বৈশালীর মুখেব দিকে তাকাল।

বৈশালীর দিক থেকে কোন জবাব আসে না।

তা তুমি আবাব বিয়ে করলে না কেন ? মানব শুধালো।

কে বললে বিয়ে করিনি ?

তাহলে এতক্ষণে সেটা আমি নিশ্চয়ই বুঝতে পাবতাম।

তোমাব যদি আব কোন কথা না থাকে তাহলে—

যেতে বলছো ?

হ্যাঁ। বৈশালী বললে।

যাবো বৈকি—এখনি যাবো। খোকনকে একবার এখানে পাঠিয়ে দেবো কি ?

না, না।

কেন ? ভয় করে বুঝি ?

আমি তো এমন কিছুই করিনি যার জন্য মাযের পরিচয়ে তার সামনে আমাব দাঁড়াতে ভয় হতে পারে।

তবে না করছো কেন ?

কোন প্রয়োজনই নেই বলে—শান্ত গলায় বৈশালী বললে।

কথাটা কি পুরোপুরি তোমার সত্যি ?

সত্যি বৈকি। তারপর একটু থেমে পূর্ববৎ শান্ত গলায় বৈশালী

বললে, ভুলে যাওনি নিশ্চয়ই সেদিন যখন মাত্র আট বছরের বালক ছিল তখনই সে স্পষ্ট গলায় কথাটা জানিয়ে দিয়েছিল ?

হয়ত তার পিছনে ছিল মায়ের কাছ থেকে যে স্নেহটা সেদিন তার প্রাপ্য ছিল সেটা সে সবটুকু পায়নি বলেই—তোমার গান বাজনা নিয়ে যদি সেদিন দিবারাত্র অতটা না ব্যস্ত থাকতে—

থাক। বৈশালী হঠাৎ বাধা দিল মানবকে। বললে, যা ধুয়ে মুছে শেষ হয়ে গিয়েছে—

এত সহজেই কি সব শেষ হয়ে যায় ? তাছাড়া আমার কথা ছেড়ে দাও, সে তোমার সন্তান।

বৈশালী স্বামীর প্রশ্নের জবাবে কিছু বলে না—মুখটা অন্য দিকে কেবল ফিরিয়ে স্তব্ধ হয়ে থাকে।

মানব বলতে থাকে, এই পনের বছর ধরে হয়ত কোন একটা প্রশ্ন তাকে পীড়ন করেছে এবং হয়ত প্রথম প্রথম ছিল অস্পষ্ট—আজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

তার—তার মা তো আর বেঁচে নেই—ধরা গলায় বললে বৈশালী।

বল তো তাকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিতে পারি—তার প্রশ্নের জবাবটা না হয় তুমিই দিও।

জবাব না পেলেও কোন ক্ষতি হবে না, বৈশালী বললে, সবাই যেমন সব কিছু ভুলে যায়, ভুলে যেতে পারে, সেও একদিন সব ভুলে যাবে।

সত্যি—কি বিচিত্র মন তোমাদের মেয়েদের! বললে মানব। তোমাকে বোধহয় কোন দিনই বুঝতে পারিনি!

এখুনি মা হয়ত এসে পড়বেন যে কোন মুহূর্তে। তুমি এবার যাও। বৈশালী বললে।

বৈশালী—

মানবের সম্বোধনে বৈশালী ওর দিকে মুখ তুলে তাকাল।

আবার কি—

কি, থামলে কেন ?

বলছিলাম আবার কি নতুন করে সব শুরু করা যায় না ?

কিন্তু এই যে পনেরটা বছর তাকে তো তুমিও পারবে না ভুলে যেতে, আমিও পারব না।

তোমার কথা জানি না—তবে আমি ভুলে যাবো—ভুলে যেতেই বোধ হয় চাই।

না, তা হয় না। এসো তুমি।

মানব কিছুক্ষণ বৈশালীর মুখের দিকে চেয়ে রইলো, তারপর শান্ত গলায় বললে, আমি কিন্তু সত্যি সত্যি তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছিলাম। তুমি বোধ হয় ভুল করছো।

ভুল আর দ্বিতীয়বার আমি করতে চাই না। তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

না গেলে জোর করে নিয়ে যাবো তোমায় সে অধিকার আজ আর আমার কোথায়। আচ্ছা তবে চলি—

কথাটা বলে ধীরে ধীরে মানব ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

বার

সদর দরজাটা খুলে বের হতেই আনন্দময়ীর সামনাসামনি পড়ে গেল মানব। মানব একবার আনন্দময়ীর দিকে তাকাল, আনন্দময়ীও তাকালেন মানবের দিকে একটু যেন বিস্ময় নিয়েই।

মানব ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে গলির মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলল।

আনন্দময়ী কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন ক্রমঅপস্রিয়মাণ মানবের দিকে তাকিয়ে, তারপর এক সময় এসে খোলা দরজাপথে গৃহে প্রবেশ করলেন।

দরজার খিলটা তুলে দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে সোজা এসে বৈশালীর ঘরে প্রবেশ করলেন।

পিছন ফিরে প্রস্তর-প্রতিমার মত দাঁড়িয়ে ছিল তখনো বৈশালী

আনন্দময়ী ডাকলেন, মেয়ে—

বৈশালী ফিরে তাকাল।

বৈশালীর দু চোখে জলের ধারা তার গণ্ড ও চিবুক প্লাবিত করে দিচ্ছে।

কে এসেছিল মেয়ে?

বৈশালী আর নিজেকে রোধ করতে পারে না। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে।

আনন্দময়ী এগিয়ে এসে রোরুদ্যমানা বৈশালীকে নিজের বক্ষের উপরে টেনে নিলেন।

আনন্দময়ীর বুঝতে কষ্ট হয় না কে এসেছিল একটু আগে এই গৃহে। রোরুদ্যমানা বৈশালীর পিঠে পরম স্নেহে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, হতভাগী, এত বড় সুযোগটা হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও ফিরিয়ে দিলি মা।

মা—

যা, তাড়াতাড়ি যা। এখনো হয়ত বেশী দূর যায়নি।

নিঃশব্দে মাথা নাড়ল বৈশালী আনন্দময়ীর বুকের মধ্যে।

ওরে শোন্! আমার কথা শোন্! যা ফিরিয়ে নিয়ে আয়।

না মা—তা আর আমি পারবো না।

পারবি না?

না। এই দিনটির জন্য যে আমার সমস্ত মন এই পনের বছর ধরে প্রতীক্ষা করেছে। প্রতীক্ষা করে করে বৈশালী মরে গেছে।

আনন্দময়ী আর কিছু বললেন না।

সারাটা রাত ভাবল বৈশালী।

না। সে ভুল করেনি।

পনের বছর আগে যা সম্ভব ছিল আজ আর তা সম্ভব নয়। আর কেউ না জানুক ঈশ্বর তো জানেন শবরীর মত সে দিনের পর দিন এই দিনটির প্রতীক্ষা করেছিল। মানব আসবে—আবার ফিরে আসবে

একদিন—তাকে খুঁজে বের করবে—বলবে, চল শৈলী, ঘরে ফিরে চল।

কিন্তু কই, মানব তো এলো না।

এই পনের বছর ধরে তিলে তিলে বৈশালীকে নিঃশেষ হতে হয়েছে।

হ্যাঁ, সে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল সেদিন হঠাৎ পুত্রকে সামনে দেখে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে মন আবার শান্ত হয়ে এলো।

পনের বছর আগে যে মা তার জীবন থেকে সরে গিয়েছে সে তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, সে মার সত্যতা তার কাছে আজ কতটুকু।

একটা স্মৃতি মাত্র। তার বেশী তো কিছুই নয়।

আজ সেই বাপ আর ছেলের মাঝখানে ফিরে গেলে তারা তাকে গ্রহণ করবে ঠিকই, কিন্তু সে—সে নিজে কি পারবে তাদের আজকের অস্তিত্বের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিতে!

পনের বছরের একটা কাঁটা কি নিরন্তর খিচ্‌খিচ্‌ করে বিঁধবে না।

না, তার মত দৈন্য আর কি আছে।

থাক তারা বাপ ছেলে।

পনের বছর পরে আবার তাদের মধ্যে ফিরে গিয়ে একটা জটিলতার সৃষ্টি করবে না। সেটা বোধ হয় তিনজনের কারো পক্ষেই মঙ্গল হবে না।

যে মঙ্গলসূত্র পনের বছর আগে টেনে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে তাকে আবার নতুন করে বাঁধবার চেষ্টা করা—মিথ্যে একটা বিড়ম্বনার বোঝা বাড়িয়ে তোলাই হবে শুধু।

পরের দিন বিশ্বনাথের মন্দির থেকে ফিরে দেখলেন আনন্দময়ী—বৈশালী নেই। চলে গিয়েছে, একটা ছোট্ট চিঠি লিখে রেখে গিয়েছে তার ঘরের টেবিলের উপরে একটা পেপারওয়েট চাপা দিয়ে।

ছোট্ট চিঠি—

মা,

আমি চলে যাচ্ছি। রাগ করো না আমার 'পরে।

মনকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছি কিন্তু পারলাম না।

অনেক ভেবে দেখলাম, পনের বছর আগে যে সংসার ছেড়ে চলে এসেছি সেখানে আর ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়।

হয়ত কারোই মঙ্গল হবে না।

তোমার হতভাগিনী মেয়ে—বৈশালী।

চিঠিটা পড়ে আনন্দময়ী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ক্লান্ত অবসন্ন পা দুটো কোনমতে টানতে টানতে মানব হোটেলে ফিরে এলো।

আর থেকে কি হবে। বৈশালী তো স্পষ্ট জানিয়ে দিল পনের বছর আগে যে বাড়ির চৌকাঠটা সে ডিঙিয়ে এসেছে আর সে-চৌকাঠ সে পার হবে না।

আশ্চর্য, মানবের মনের মধ্যে কিন্তু এতটুকু বিদ্বেষ বা অভিমানই ছিল না। বরং কি একটা আনন্দ যেন ফিরে না পাওয়ার ব্যথা ও লজ্জাকে একটা শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিচ্ছে।

আর এখানে বসে থেকে কি হবে।

হোটেলের ম্যানেজারকে বললে, যদি ঐ দিন কলকাতায় ফিরে যাবার কোন একটা ব্যবস্থা তিনি করে দিতে পারেন।

ভদ্রলোক কিছু দিয়ে ব্যবস্থা একটা করে দিতে পারবেন বললেন।

মানব ম্যানেজারকে টাকা দিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এলো।

পরের দিন রাত্রে ডিনার টেবিলে ছেলের সঙ্গে দেখা হলো মানবের।

সৌগন্ধ বললে, কই ড্যাডি, তোমার শরীর তো তেমন কিছু একটা সারেনি দেখছি। আরো কিছুদিন বাইরে থেকে এলেই পারতে।

মানব মৃদু হাসে।

খোকন—

কিছু বলবে?

এই ফ্ল্যাটটা বিক্রি করে দিয়ে একটা বড় দেখে অন্য ফ্ল্যাট কিনবো

ভাবছি—মানব বললে।

কেন, এ ফ্ল্যাটটা তো ভালই।

তোমার বিয়ে হলে এ ফ্ল্যাটটায় কুলবে না।

সৌগন্ধ হেসে ওঠে।

তার এখনো অনেক দেরি আছে ড্যাডি।

ভাল কথা, তোমার সেই বান্ধবীটিকে তো আজকাল আর এখানে আসতে দেখি না।

কার কথা বলছো?

ঐ যে মেখলা না কি যেন মেয়েটির নাম।

মনে হচ্ছে তুমি যেন মেখলা সম্পর্কে হঠাৎ একটু—

মেয়েটিকে আমার খুব ভাল লাগে। ভাবছি মেয়েটির বাবার সঙ্গে কথা বলে রাখবো।

না, না, ড্যাডি।

কেন—তুমি কি তাকে পছন্দ করো না?

ওসব কথা কখনো আমার মনেই হয়নি আজ পর্যন্ত। তাছাড়া পাস করে আগে আমি বিলেত ঘুরে আসি তারপর ঐসব কথা ভেবো।

মানব মৃদু মৃদু হাসে।

কিছুক্ষণ পরে আবার বলে, হঠাৎ কেন আমি ছুটি নিয়ে বাইরে গিয়েছিলাম জান?

কেন?

যে প্রশ্নটা তোমার মনে জেগেছিল সেই প্রশ্নটা আমারও মনে জেগেছিল।

তুমি বেনারস গিয়েছিলে ড্যাডি?

হ্যাঁ, আর তোমার মার সঙ্গে দেখাও হয়েছিল।

খুঁজে পেয়েছিলে তাঁকে?

পেয়েছিলাম।

কি বললেন তিনি?

ফিরে আসতে আর তোমার মা সম্মত নন।

সম্মত নন ?

না।

সৌগন্ধ আর কোন কথা বলতে পারে না। চুপ করে বসে থাকে।

তারপর একসময় বললে একটু থেমে থেকে, আমি কিন্তু ভেবেছিলাম ড্যাডি—

কি ভেবেছিলে খোকন ?

তুমি ডাকলে হয়ত তিনি আসবেন।

তুমি কি একবার সেখানে যেতে চাও ?

মৃদুকণ্ঠে সৌগন্ধ বললে, না।

মানব আর কোন কথা বললে না।

তের

প্রত্যুম্নর কলকাতার ঠিকানাটা বৈশালী জানত। হাওড়া স্টেশনে নেমে একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা প্রত্যুম্নর টালিগঞ্জের ফ্ল্যাটের সামনে এসে নামল।

দোতলায় ৪৮ নং ফ্ল্যাট। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে সুটকেসটা হাতে ঝুলিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেল বৈশালী।

৪৮ নং ফ্ল্যাটের কলিং বেলের বোতামটা টিপল।

একজন ভৃত্য এসে দরজা খুলে দিল।

এটা প্রত্যুম্নবাবুর ফ্ল্যাট ?

হ্যাঁ।

তিনি আছেন ?

আছেন, এখুনি বেরুবেন—আপনি বসুন। কি নাম বলবো তাঁকে।

কিছু বলতে হবে না। আমি বসছি।

সুসজ্জিত ছোট ড্রয়িংরুম—ছিমছাম। একটা সোফার উপরে উপবেশন করল বৈশালী।

ভৃত্য নারায়ণের কাছে সংবাদ পেয়েই প্রত্যুম্ন বের হয়ে আসে এবং

সোফায় বৈশালীকে উপবিষ্ট দেখে রীতিমত বিস্মিত হয়।

একি বৈশালী—তুমি!

বৈশালী মৃদু হেসে বললে, কেন, আসতে পারি না?

না, না—তা কেন, একশোবার আসতে পার।

খুশী হওনি?

খুশী! যা ছিল কল্পনারও অতীত—

কোথায় থাকবো—তার একটা ব্যবস্থা করে দাও।

তুমি এখানে থাকবে?

বাঃ, তাই তো এলাম।

সত্যি বলছো?

তবে কি তোমার মনে হয় মিথ্যা বলছি?

না, না—তা নয়।

তবে?

কখন এলে কলকাতায়?

সকালে। হাওড়া স্টেশনে নেমেই সোজা এখানে আসছি ট্যাক্সি নিয়ে। তুমি বেরুচ্ছ বুঝি?

হ্যাঁ। আমাদের বাণিজ্য মন্ত্রী আসছেন দিল্লী থেকে। এয়ারপোর্টে যেতে হবে।

ফিরবে কখন?

বুঝতেই তো পারছো ভূতের বেগার—ফিরতে ফিরতে বোধ হয় সন্ধ্যা হয়ে যাবে। আমি নারাণকে বলে যাচ্ছি। তুমি স্নান-টান করে বিশ্রাম কর—বলে প্রত্যুন্ন নারাণকে ডাকল।

নারাণ এলো। কি বলছেন?

আমার পাশের ঘরটা খুলে দে, ইনি থাকবেন। রান্নাবান্না করে ভাল করে খাওয়াস, বুঝেছিস?

নারাণ মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানাল।

নারাণ বললে, স্নান করবেন তো?

হ্যাঁ—বৈশালী বললে।

গরম জল নেবেন ?

না, না—আমি গরম জলে স্নান করি না।

নারাণ ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

নারাণচন্দ্রই আমার সার্ভেন্ট কুক। সংসারের দেখভাল সব কিছু ওরই উপরে। বললে প্রত্যুম্ন।

মানব চৌধুরীকে চিনতো প্রত্যুম্ন অনেক দিন থেকেই।

সরকারের একজন বড় চাকুরে মানব চৌধুরী, সেই সূত্রেই এম. পি. প্রত্যুম্ন সান্ন্যালের সঙ্গে তার আলাপ ও পরিচয়।

মানব চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ থাকলেও প্রত্যুম্ন জানত না এবং কখনো কল্পনাও করতে পারেনি সে-ই বৈশালীর স্বামী। জানবার কোন কারণও ছিল না।

ঐদিন বাণিজ্য মন্ত্রীকে এয়ারপোর্টে রিসিভ করে প্রত্যুম্ন সোজা এলো রাইটার্সে—মানব চৌধুরীর সঙ্গে কিছু কাজ ছিল সেটা সারতে।

বেয়ারা প্রত্যুম্ন সান্ন্যালকে দেখে বলল, সাহেব আপনাকে ঘরে বসতে বলেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে তিনি গেছেন, এখুনি আসবেন।

প্রত্যুম্ন ঘরে ঢুকে একটা চেয়ারে বসল।

টেবিলের উপরে নানা কাগজপত্র ও ফাইল ছড়ানো—মনে হয় মানব কাজ করতে করতে ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছে।

হঠাৎ সেই কাগজপত্রের একপাশে একটা ফটোর উপরে নজর পড়তেই প্রত্যুম্ন যেন চমকে ওঠে। একটু ইতস্ততঃ করে হাত বাড়িয়ে ফটোটা তুলে নিল।

পুরনো ফটোটা এবং একটু লালচে হয়ে গেলেও ফটোর মানুষটিকে চিনতে প্রত্যুম্নর কষ্ট হয় না। বৈশালী।

বৈশালীর ফটো।

আশ্চর্য! বৈশালীর ফটো এখানে মানব চৌধুরীর টেবিলে কেন!

তবে কি মানব চৌধুরীর সঙ্গে বৈশালীর কোন সম্পর্ক আছে! আশ্চর্য নয়—বৈশালী তো প্রথম পরিচয়ের সময় মিসেস চৌধুরী বলেই

তার পরিচয় দিয়েছিল তাকে।

মানব চৌধুরীরই স্ত্রী নয়ত বৈশালী!

ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে।

বস্তুতঃ মানব বৈশালীব চলে যাবার পর তাব সব ফটো বাড়ি থেকে সরিয়ে ফেললেও একটা ফটো তাব ফাইলের মধ্যে লুকিয়ে রেখে দিয়েছিল তাব ছেলের মতই।

অনেক বছব পবে আজই মানব অফিসে এসে ফাইলটা থেকে ফটোটা বেব করেছিল। কেন করেছিল কে জানে।

ফটোটা যেখানে ছিল সেখানেই বেখে দিল আবার প্রত্যুম্ন। একটু পরেই মানব এসে ঘবে ঢুকলো।

কতক্ষণ এসেছেন মিঃ সান্ন্যাল?

মিনিট পনেব হবে—প্রত্যুম্ন বললে।

আপনাব ফাইলটা নিয়েই মুখ্যমন্ত্রীব ঘরে গিয়েছিলাম। কাল সই করে দেবেন বলেছেন—কাল আপনি পাবেন কাগজটা।

ঠিক আছে। আচ্ছা মিঃ চৌধুবী, একটা কথা বলবো যদি না কিছু মনে কবেন?

কি আশ্চর্য! মনে কববো কেন, বলুন না।

আচ্ছা ওই ফটোটা কার? আপনার কোন আত্মীয়া কি?

কেন বলুন তো—রীতিমত কৌতূহলী হয়ে ওঠে মানব। ওটা একটা অনেক দিনের পুরাতন ফটো। আপনি ওকে চিনতেন নাকি?

চিনি।

চেনেন!

হ্যাঁ।

কবে—কখন?

এক সময় চিনতাম। কিন্তু বললেন না তো উনি কে?

আমার স্ত্রী।

আ—আপনার স্ত্রী! আপনার স্ত্রী যেন শুনেছিলাম—

কি শুনেছিলেন?

তিনি মারা গেছেন।

না।

মারা যাননি ?

না।

কি নাম বলুন তো ছিল আপনার স্ত্রীর—বৈশালী কি ?

হ্যাঁ। বৈশালী।

আচ্ছা আমি উঠি মিঃ চৌধুরী। কাল কাউকে পাঠিয়ে দেবো, আপনি তার হাতে কাগজটা দিয়ে দেবেন। কথাগুলো বলেই উঠে দাঁড়ালো প্রত্যুম্ন এবং নমস্কার জানিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

মানব ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারে না।

বৈশালীকে প্রত্যুম্ন সান্ন্যাল চিনলেন কি করে!

কখনো তো বৈশালীর মুখে মানব প্রত্যুম্ন সান্ন্যালের নাম শোনেনি। তাছাড়া মানব জানে মানুষটি একজন খাঁটি পলিটিসিয়ান—ব্যাচিলার—অনেকবার জেল খেটেছেন—সৎ, চরিত্রবান মানুষ।

মানব আবার বৈশালীর ফটোটা হাতে তুলে নিল।

রাত আটটা নাগাদ প্রত্যুম্ন তার ফ্ল্যাটে ফিরে এলো।

বৈশালী তার ঘরে বসে একটা বই পড়ছিল।

প্রত্যুম্নর সাড়া পেয়ে বৈশালী ঘর থেকে বের হয়ে এলো, এত দেরি হলো যে ?

প্রত্যুম্ন মৃদু হেসে বললো, নেই কাজ তাই খই ভেজে বেড়াচ্ছি আর কি। আমাদের কি কোন সময়ের হিসাব থাকে। তারপর খাওয়াদাওয়া করেছেন তো ?

হ্যাঁ। তারপরই একটু থেমে বললে, চল কালই রেজিস্ট্রি অফিস।

কেন ?

বাঃ, রেজিস্ট্রি অফিসে একটা নোটিস দিতে হবে না ?

তা হবে। তাছাড়া এত বড় একটা ব্যাপার—রেজিস্ট্রি করতে হবে বৈকি। কিন্তু ব্যাপারটা বেশ ভাল করে সুস্থ মস্তিষ্কে ভেবে

দেখেছো তো ?

দেখেছি।

ঝোঁকের মাথায় আবার একটা ভুল করতে চলেছো না তো ?

ভুল !

হ্যাঁ, ভুল। একবার ভুল করে পনের বছর ধরে তার জের টেনেছো —আবার ভুল করে বাকী জীবনের জন্য অনুতাপ করো না।

না—ভুল করছি না।

অনুরাধা—

না, অনুরাধা নয়, আমি আমার সত্যিকারের পরিচয়েই তোমার কাছে এসেছি। সমস্ত মোহ, বন্ধন ও অতীতকে একেবারে মুছে ফেলে খোলা মন নিয়ে। আমাকে তুমি বৈশালী বলেই ডেকো।

না—তুমি আমার জীবনে অনুরাধা হয়েই থাকো।

বৈশালী মৃদু হেসে বললে, বেশ—তাই হবে।

হ্যাঁ, অন্ততঃ জানবো আমার অনুরাধার উপর কারো কোন দিন কোন দাবি ছিল না—আজো থাকতে পারে না। সে একান্ত ভাবেই আমার—একা আমারই। যাক সে সব কথা, কাল সকালে আমরা এক জায়গায় যাবো।

কোথায় ?

গেলেই দেখতে পাবে।

আগে বলবে না বুঝি ?

না।

জানলে ক্ষতি হবে ?

না, ক্ষতি নয়।

তবে বলবে না কেন ?

গেলেই তো জানতে পারবে।

পরের দিন সকালে প্রদ্যুম্ন বৈশালীকে নিয়ে বের হলো, রাস্তা থেকে একটা খালি ট্যাক্সি ধরলো। কিছু দূর যাবার পরই বৈশালী বললে,

এদিকে কোথায় চলেছো ?

পথটা তোমার চেনা—না ?

হ্যাঁ।

তা তো চেনা হবেই।

মানে ?

এ পথে তুমি যে গেছো বারবার।

চমকে ওঠে বৈশালী, এতক্ষণে তার মনটা রীতিমত সন্দেহাকুল হয়ে ওঠে।

কোথায় যাচ্ছো ?

মানব চৌধুরীর কাছে।

সে কি, কেন ?

বাঃ, রেজিস্ট্রি করার আগে তাকে একটা সংবাদ দিতে হবে না ?

না, না। ছিঃ, এসব কি করছো তুমি ?

অনুরাধা—মানব চৌধুরী আজো আমি জানি বৈশালী চৌধুরীর জন্য অপেক্ষা করছে।

আমাদের অনেক দিন ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে, সে আজ আর আমার কেউ নয়। চল—ফিরে চল। ওখানে আমাকে তুমি নিয়ে যেতে পার না।

আমার কথা শুনবে না ? কথাটা বলে প্রদ্যুম্ন বৈশালীর একখানি হাত ধরলো।

না, না—

অনুরাধা, সেও তোমাকে আজো ভুলতে পারেনি—তুমিও তাকে ভুলতে পারনি। তাছাড়া ভুলো না তোমার সন্তান আছে। তুমি এক-জনের শুধু স্ত্রীই নও—মা। স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক তোমরা শেষ করে দিলেও মায়ের ছেলের সম্পর্ক তো শেষ করে দেওয়া যায় না, কোন আইনের জোরেই নয়, কোন আইন আজো তৈরিই হয়নি।

তুমি—বৈশালী আর বলতে পারে না, অশ্রুতে যেন গলার স্বরটা বুজে আসে।

ট্যাক্সিটাকে হঠাৎ বলে প্রত্যুম্ন—রোক্‌কে রোক্‌কে সর্দারজী।

হিঁয়াই—সাব?

হ্যাঁ—রুখিয়ে।

ট্যাক্সিটা থামল।

সেই পরিচিত ফ্ল্যাট বাড়িটার সামনে, পনের বছর আগে যে ফ্ল্যাট বাড়িটা ছেড়ে বের হয়ে গিয়েছিল বৈশালী।

জলে বৈশালীর দু চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে।

এসো—ডাকলো প্রত্যুম্ন, নামো।

বৈশালী ট্যাক্সি থেকে নামল।

কাঁপছে তখন বৈশালী।